সেপ্টেম্বর ২০১৯ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৬

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী শক্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন

আরিবা জাকির, দ্বিতীয় শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

মো. ইহসানুল হক সিফাত, কেজি শ্রেণি, উত্তরণ স্কুল, মান্ডা, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৬

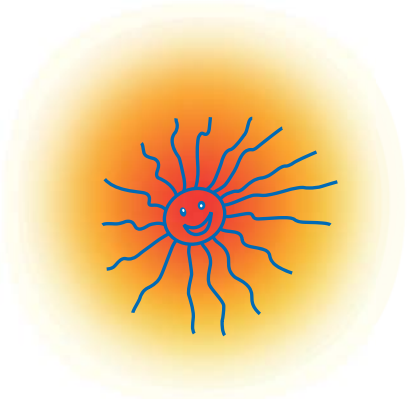

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো. জাহিদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

শুভ জন্মদিন, শিশুদের বন্ধু প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। মধুমতি নদী বিধৌত গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার এক নিভৃত পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান।

বন্ধুরা, তিনি উন্নত-সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার। তাঁর মেধা-মনন, সততা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি বাঙালি বিশ্বসভায় আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, আয়রনম্যান এদেরকে সুপার হিরো হিসেবে চেনো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু একজন সুপার হিরো তা কি তোমরা জানো? সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন 'ভ্যাকসিন হিরো' উপাধি। বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির অসাধারণ সাফল্যে অবদানের জন্য তিনি এ উপাধি পেয়েছেন।

শরৎ বাংলাদেশের কোমল, স্নিগ্ধ এক ঋতু। সূর্যের মিষ্টি আলোর স্পর্শ নিয়ে প্রকৃতির কানে কানে ঘোষিত হয় শরতের আগমন বার্তা। ঝকঝকে নীল আকাশে শুভ্র মেঘ, নদীর তীরে কাশবনের সাদা কাশফুল, শস্যের শ্যামলতায় হাতছানি দিয়ে ডাকে শরৎ।

প্রতি বছর ২৪শে সেপ্টেম্বর 'মীনা দিবস' আর ৩০শে সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে পালিত হয়। মীনার মতোই স্বপ্ন দেখতে শিখুক আমাদের কন্যাশিশুরা। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

সূচি

নিবন্ধ

৬ বঙ্গবন্ধু ও মোকসেদ মিয়ার গল্প/আমীরুল ইসলাম
৮ বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী শক্তি/মো. মাহমুদ-উল-হক
১৪ 'ভ্যাকসিন হিরো' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
২৮ ভয়ংকর স্ফিংস/মমতাজ খান
৩২ শহিদ আবদুস সাত্তার : কিশোর মুক্তিযোদ্ধা
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির
৫২ রোমানের সাফল্য যাত্রা/মেজবাউল হক
৫৩ নতুন বই সাথে নতুন জামা/মাকসুদ তারেক
৫৪ দাবায় সুরভি ছড়াচ্ছে খুশবু/জান্নাতে রোজী
৫৫ উক্তি/মোসলেমা নাজনীন
৫৬ হারিয়ে যেতে নেই মানা/শাহানা আফরোজ
৫৮ রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড/কামরুল হাসান
৫৮ মীনা দিবস/নুসরাত জাহান
৬০ দশ দিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬২ হাত ধোয়ায় যত ভুল/মো. জামাল উদ্দিন
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

লোক কাহিনি

১৭ কথার মূল্য/মোসা. তানিয়া আক্তার

কবিতা

০৪ ব্রত রায়
০৫ শাফিকুর রাহী
১৫ তানজিন দেলওয়ার খান (রিজ)/সালাম ফারুক
রোকসানা গুলশান/মো. জাওয়াদ হোসেন
৪৬ মো. মুশফিকুর রহমান (মিদুল)

গল্প

১৯ পাখি মামা ও শামুকখোল/দিলারা মেসবাহ
২৪ কাকের বনবাস/শামীমা জাফরিন
৩০ অন্তু ও নীল মানুষ/সৈয়দা নাজমুন নাহার
৩৭ বিহঙ্গ সখা বৃক্ষ/মানিক বৈরাগী
৪১ অর্থি ও তার বন্ধুরা/হামিদুর রহমান
৪৩ এক জোড়া স্যান্ডেল/সৈয়দ মনজুর কবির
৪৫ সিন্দুক রহস্য/অবনিল আহমেদ
৪৭ মিঠির জাদুর কলম/জ্যোৎস্নালিপি
৫০ ভাষা-দাদুর সঙ্গে : পিটপিট, খাঁ খাঁ, ছমছম
তারিক মনজুর

ভ্রমণ

৩৫ খৈয়াছড়া ঝরনায় একদিন/রুমান হাফিজ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: মো. ইহসানুল হক সিফাত/আরিবা জকির
শেষ প্রচ্ছদ: শ্রেয়সী শংকর কুন্ডু
০৩ তারিনা সুলতানা রিপা/আরিসা তাজমিন হুদা
২৩ তাহসিন জায়েদিন খান জাওয়াদ
২৯ আফিয়া মাহমুদা লামিশা
৩১ তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ
৩৬ তাহমিনা রহমান নিশাত
৪১ রাফান ইবনে মেহেদী
৫৯ শেখ তানভীর ইসলাম (জিতু)/অনিন্দ্য অন্তরিক্ষ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

ছোটোদের আঁকা ছবি

তারিনা সুলতানা রিপা, ৭ম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

আরিসা তাজমিন হুদা, ১ম শ্রেণি, এসএফএক্স গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

কবিতা

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সোনার বাংলা গড়ব

ব্রত রায়

দেশটা তখন হারিয়েছে পথ, মাথা চাড়া দেয় জঙ্গি
যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদীরা হয়েছিল তার সঙ্গী।
বিদ্যুৎ নেই, আইন-শৃঙ্খলা পড়েছিল মুখ থুবড়ে
দুঃশাসনের ঘিরেছে আঁধার, কষ্ট লোকের খুব রে!

সেই দুর্দিনে হাল ধরেছিলে, মানুষ পেয়েছে ভরসা
উদ্বেগ-মেঘ কেটে গিয়ে ফের আকাশ হয়েছে ফর্সা।
দেশকে করেছ যুদ্ধাপরাধী এবং জঙ্গি মুক্ত
এদেশ হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত।
উন্নয়নের সড়কে রয়েছি, অভাব লোকের ঘুচছে
সব ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ ক্রমশ উঠছে উচ্চে।

একথা সত্য, এখনো রয়েছে বহু কাজ অবশিষ্ট
দুঃশাসনের জাঁতাকলে আর না হোক মানুষ পিষ্ট।
নারী, শিশুসহ প্রতিটি মানুষ পায় যেন নিরাপত্তা
সমতার সাথে বিকশিত হোক প্রতিটি মানব সত্তা।
দুর্নীতি সব দূর হয়ে যাক, ভুলগুলো আর চাই না
জাতির পিতার স্বপ্ন তবেই সার্থক হবে, তাই না?

পরম আপন সাহসিকা

শাফিকুর রাহী

কৃষক ভাইয়ের রাঙা ডেরায় ছনের চালায়;
সুখের ঝিলিক নতুন বধূর রঙিন বালায়।
অন্ধ-অজ-পল্লি গাঁয়ে আলোর নাচন
সুখ-আনন্দে মাটির সাথে নিত্য বাঁচন।
সবখানেতে ডিজিটালের আলোর আভায়
মনটা নাচে; নতুন করে বাঁচতে ভাবায়।

ভোট ও ভাতের অধিকারের শপথ পাঠে;
কার ডাকেতে জাগল মানুষ আঁধার মাঠে!
ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারায় চলতে পথে
চড়বে সবাই সখ্য এবং সাম্য রথে।
সকল ক্ষেত্রে সফলতায় সম্ভাবনায়
কে সে মহান; দূরদর্শী পথ যে দেখায়।

পিতার স্বপ্ন বৈষম্যহীন স্বদেশ গড়ার;
দীক্ষা যে দেয় আঁধার ভেঙে যুদ্ধে লড়ার!
তিমিরনাশী কার ডাকেতে বইল জোয়ার;
কার গরিমায় দুঃশাসনের ভাঙল খোঁয়াড়!
জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি সাহসিকা–
বীর বাঙালির পরম আপন নির্দেশিকা।

ভয়ার্তকাল স্বজনহারার দুঃখ বুকে
গরিব দুখি নিরন্নদের মলিন মুখে
ভালোবাসার আশায় আলোয় ফুটল হাসি
প্রাণের টানে গাইল গীতি স্বদেশবাসী।
অধিকারহীন ছিটবাসীদের আঁধার ঘরে;
কার নেতৃত্বে জ্বলল বাতি; কে সে লড়ে!

নীল সাগরের ঊর্মিমালায়, জোয়ার-ভাটায়
স্বমহিমায় বীর দাপটে পাল যে খাটায়
দেশরত্নের গৌরবোজ্জ্বল অভিযাত্রায়,
স্বদেশ প্রেমে এগিয়ে চলেন ভিন্নমাত্রায়।
বীর দাপটে পিতার স্বপ্ন সাহস বুকে,
এগিয়ে চলেন শত বাধার আঁধার রুখে।

বীরত্বেরই গর্ব গাথায় আপন টানে,
আনন্দেরই ঝর্ণাধারা সবার প্রাণে।
অনিয়মের নিয়মনীতি দূর হয়ে যাক,
দেশের দুশমন গুপ্তঘাতক যাক পুড়ে যাক।
আলোকিত এক আগামী বিনির্মাণে
সম্প্রীতি সুর বেজে উঠুক সবার প্রাণে।

বঙ্গবন্ধু ও মোকসেদ মিয়ার গল্প

আমীরুল ইসলাম

ধানমন্ডি তখন শান্তশিষ্ট নিরিবিলি শহর। দুএকটা গাড়ির শব্দ পাওয়া যায় মিরপুর রোডে। আর রিকশার টুংটাং সারাদিন লেগেই থাকে। বাসার সামনে গভীর লেকে নানারকমের মাছ।

১৯৭৩ সাল। ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটা দোতলা। ছোটো একটা বাড়ি। কিন্তু এই বাড়িতে থাকেন বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সাদাসিধে। থাকেন চুপচাপ। মানুষকে তিনি ভালোবাসেন নিজের জীবনের চেয়ে অধিক। দুই মেয়ে তিন ছেলে নিয়ে তাঁর সাজানো সংসার। মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন, জেল-জুলুম, মিছিল, মিটিং এই নিয়ে সারাজীবন তিনি নিজের সংসারের দিকে তাকানোর অবসর পাননি। তাঁর স্ত্রী বেগম মুজিব সংসারটা আগলে রেখেছেন। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছেন।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরেছেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর অন্যতম সেরা রাজনৈতিক নেতা। সারা বিশ্বজুড়ে তাঁকে নিয়ে আলোড়ন চলছে। দেশে দেশে বঙ্গবন্ধুর নামে জয়ধ্বনি। বড়ো বড়ো পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে ফিচার। টেলিভিশনে তাঁর ছবি আর রেডিওতে কণ্ঠস্বর।

বঙ্গবন্ধু ফিরেই দেশ গঠনের কাজ শুরু করলেন। সারা দিন-রাত ব্যস্ত তিনি। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তিনি। কিন্তু আচার-আচরণে একেবারে সাধারণ।

একদিন তিনি বাসা থেকে বের হচ্ছেন এমন সময় দেখেন গেটের বাইরে জবুথবু হয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লুঙ্গি ও ব্যাপারি জামা। খালি পা। মাথায় সাদা টুপি। তার হাতে একটা লম্বা লাউ আর সাথে বাজারের ব্যাগ। বঙ্গবন্ধু তাকে খেয়াল করলেন। গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন।

কিরে বাড়ি কই। নাম কী? এইখানে কী করস?

লোকটা জড়সড় হয়ে কাঁচুমাচু কণ্ঠে বলল,

লিডার, আমার নাম মোকসেদ মিয়া। আমারে চিনবেন না। এইখানে ক্যান?

ধানমন্ডি ৩২নং রোডের এ বাড়িতেই থাকতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আপনারে দেখতে আইছি।

বাড়ি আমার ময়মনসিংহ।

দেখলি তো আমারে?

অহন কী করবি?

বঙ্গবন্ধু জলদকণ্ঠে জানতে চাইলেন।

বাড়ি যামু গা।

ভাড়া আছে?

লোকটা হাত দুটো এক করে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যাগে কী আছে রে।

এবার মোকসেদ মিয়া হাসিখুশি হয়ে উঠল।

লিডার আপনার জন্য নিয়া আইছি। বেয়াদবি নিয়েন না। নিজের ক্ষেতের একটা লাউ। আর নতুন আলু আছে ব্যাগে।

বঙ্গবন্ধু হাসলেন। তারপর বললেন,

আমার কাছে তো টাকা নাই। আমি তোর এই দাম শোধ করমু কেমনে।

মোকসেদ মিয়া জিভে কামড় দিয়ে উঠল।

বঙ্গবন্ধু তখন বললেন,

তোর লাউ, আলু রেখে যা। বিকেলে তোর সঙ্গে কথা হবে। আছিস তো তুই?

হ্যাঁ।

বঙ্গবন্ধু কাউকে অর্ডার দিলেন।

মোকসেদ মিয়ার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে কথা বলব।

সারাদিনের ক্লান্তিহীন ব্যস্ততা শেষে বঙ্গবন্ধু ঘরে ফিরলেন। দেখলেন দারোয়ানদের সাথে গেটেই সে বসে আছে।

কী রে আইছস?

জি লিডার।

তুই থাক তরে আমি ডাকুম।

বঙ্গবন্ধু খুব দ্রুত কাজ করতেন। ফ্রেশ হয়ে নিলেন ঝটপট। সন্ধ্যায় আরাম কেদারায় বসে চা-বিস্কুট খেলেন। ততক্ষণে বাড়ির নিচতলায় শত শত মানুষের আনাগোনা। নানা কাজে তারা বঙ্গবন্ধুর কাছে আসে। মানুষের কত যে সমস্যা। তারা মনে করে বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলে সমস্যার সমাধান হবে। বঙ্গবন্ধু সবার অভিযোগ শোনেন। তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করেন। আজ সন্ধ্যায় প্রথমেই মোকসেদ মিয়াকে ডেকে পাঠালেন।

তুই তোর ক্ষেতের লাউ আমার জন্য এনেছিস কেন?

আদরের সুরে জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু।

লিডার আমি গরিব মানুষ। টাকা থাকলে আমি মিষ্টি কিন্যা আনতাম।

বঙ্গবন্ধুর মুখে মৃদু হাসি।

যুদ্ধ কেমন করলি?

লিডার পুরা নয় মাস জামালপুরে গোপনে আছিলাম। অনেক অপারেশন করছি। অহনও যদি যুদ্ধ করতে হয় লিডার খালি হুকুম দ্যান। কল্যা নামাইয়া দিমু।

কও কী মোকসেদ মিয়া।

তুমি প্রধানমন্ত্রীর সামনে কথা বলতেছ। বুঝো ব্যাপারটা?

এবার বঙ্গবন্ধু উচ্চৈঃস্বরে হাসেন। তারপর নিজের পকেটে হাত দেন। না। তার কাছে কোনো টাকা নেই।

দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কিন্তু নিঃস্ব।

তার কাছে টাকা থাকে না। তারপর কাকে যেন ডাক দিলেন। বললেন, মোকসেদ মিয়াকে কিছু টাকা দিয়ে দাও। ওর আসা-যাওয়ার ভাড়া।

এবার মোকসেদ মিয়া হাসতে লাগলেন।

ট্যাকা ছাড়াই আমি ঢাকায় আইসা পড়ুম।

পাগলা যা তুই।

বঙ্গবন্ধু মোকসেদ মিয়াকে বিদায় দিলেন।

মোকসেদ মিয়া মাঝেমধ্যেই ৩২ নম্বরে আসতেন। সেই একই পোশাক। মলিন। ছিন্ন। হাতে জীর্ণ বাজারের ব্যাগ। ব্যাগে উঁকি দেয় নানা রকম শাকসবজি। বঙ্গবন্ধুর কোনো আপত্তি মানতে রাজি নয় মোকসেদ। দেশ দরদি নেতার জন্য এটা তার ভালোবাসা। ■

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী শক্তি

মো. মাহামুদ-উল-হক

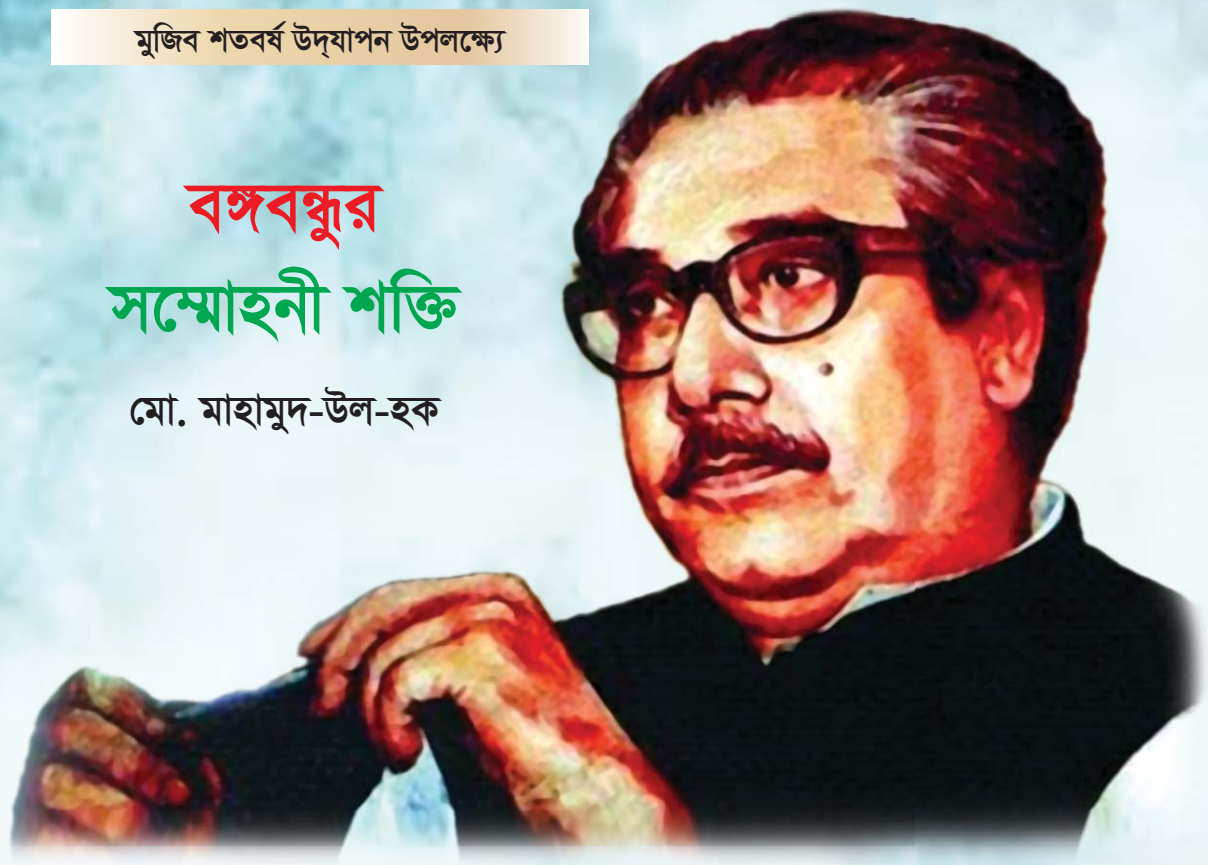

আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৭৫ সালের ঘটনা। পাইন্দং উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি। ফটিকছড়ি থানার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়টির পাশে একটি চায়ের দোকান ছিল। দোকানদার একজন টগবগে যুবক। গায়ের রং ফর্সা। এত ফর্সা যেন তার ধমনিতে প্রবাহিত রক্ত সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। দোকানদারের নাম আবু তাহের।

আমার এক সহপাঠী হারুন অর রশীদ। তার চাচা আহমদ রশীদ ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন খাঁটি সৈনিক। সকালে ঘর থেকে বের হন। পার্টিকে সময় দেন আর দলের কাজ সেরে গভীর রাত্রে বাসায় ফিরেন। পকেটে টাকা নেই। কাজ নেই। তাতে কি, রাজনীতিতে তাঁর প্রবল আগ্রহ। তবে কোনো লোভ ছিল না। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের একজন ত্যাগী সৈনিক। আহমদ রশীদকে আমি চাচা ডাকতাম। আমার সহপাঠীর সুবাদে প্রতিদিনই তাদের বাসায় যেতাম। সেখানে তাঁর সাথে সবসময় দেখা হতো। তিনি চাইতেন আমরাও বঙ্গবন্ধুর একজন একনিষ্ঠ সৈনিক হই। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উৎসাহিত হই। আমি ও হারুন দুজনই মোটামুটি ভালো ছাত্র ছিলাম। পড়ালেখার চাপও ছিল বেশি। তারপরও স্কুল শেষে প্রায় প্রতিদিন চাচার সাথে বসে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, রাজনৈতিক দর্শন ও সাধারণ মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বিশেষ করে দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রাম, অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করত। এভাবে কখন যে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গেলাম বুঝতেই পারলাম না।

সদ্য স্বাধীন দেশের সংস্কার ও বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু তখন দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। মাঠে-ময়দানে ঘুরে ঘুরে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজখবর নেওয়া, যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশের পুনর্গঠন, জনগণের কল্যাণে কাজ করা এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল

বঙ্গবন্ধুর প্রধান লক্ষ্য। দিনরাত পরিশ্রম করে তিনি সোনার বাংলা তৈরির কাজে ব্যস্ত। শয়নে স্বপনে তাঁর ভাবনা একটি উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। তাঁর স্বপ্ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার। তাই তো তিনি আমাদের বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা। সত্যিই তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

একদিন আহমদ রশীদ চাচা আমাদের স্কুলে এলেন। তাঁর সাথে দেখা হলে আমাকে তিনি তাঁর সাথে ফটিকছড়ি সদরে যেতে বললেন। ফটিকছড়ি সদরে নুরুল আলম চৌধুরী এমপি আসবেন। চাচার সাথে নুরুল আলম চৌধুরীর অত্যন্ত সখ্য। এমপি সাহেবও বঙ্গবন্ধুর একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী, আদর্শবান ও নির্লোভ ব্যক্তি। খুব কাছে থেকে দেখা একজন খাঁটি মানুষ। ফটিকছড়ি সদরে যাবার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর বেতবুনিয়ায় আগমন উপলক্ষ্যে নেতৃবৃন্দের সাথে ঘরোয়া বৈঠক। নেতারা যার যার এলাকা থেকে আসবেন। এমপি সাহেব তাদেরকে নির্দেশনা দিবেন। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে।

সভা শুরু হবার কথা সকাল ১০টায়। আমি এবং চাচা সকাল ৮টায় রওনা দিলাম ফটিকছড়ি সদরের উদ্দেশ্যে। দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। পায়ে চলা মেঠো পথ। কোনো বাহন নেই। রাস্তায় চলার মতো শুধু সাইকেল ছাড়া কিছুই নেই। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে সকাল ১০টায় যথারীতি ফটিকছড়ি সদরে পৌঁছি। এমপি সাহেব তখনো ফটিকছড়ি আসেননি। তাঁর অবস্থান কোথায় তাও জানা যাচ্ছিল না। আমরা সবাই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকলাম। অপেক্ষা করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। এমপি সাহেব তখনো পৌঁছাননি। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। চাচার পকেটে তেমন টাকাও ছিল না। দুপুর গড়িয়ে প্রায় দুটো বাজে। চাচা পকেটে হাত দিয়ে আট আনা আধুলি খুঁজে বের করলেন। একটি তন্দুরি রুটি, দুই কাপ চা। চাচা-ভাতিজার দুপুরের খাবার। সাথে এক গ্লাস পানি। তখন প্রায় বেলা তিনটা।

বিকাল ৩টায় এমপি সাহেবের আগমন ঘটল। আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। এমপি সাহেব খুবই ব্যস্ত। বঙ্গবন্ধু আসবেন চট্টগ্রামে। বঙ্গবন্ধুকে বরণ করার জন্য অনেক কাজ বাকি। নেতৃবৃন্দকে নির্দেশনা দিলেন কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করা যায়। মাঝখানে চাচা আমাকে এমপি সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভাতিজা বলে। এমপি সাহেব আমাকে আদর করলেন। আমার লেখাপড়ার কথা শুনে উৎসাহ দিলেন। ভালো ফলাফল করার জন্য উপদেশ দিলেন। সভা শেষে সন্ধ্যা অবধি আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

বঙ্গবন্ধুর আগমনের দিন ঘনিয়ে এল। বেতবুনিয়া আসবেন ১৪ই জুন, ১৯৭৫ সালে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর এটি প্রথম সফর। ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করবেন। চট্টগ্রামে সাজ-সাজ রব। আগের দিন ঘোষণা এল বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে স্কুল ছুটি। আমরা মহাখুশি। এমন একজন মহানায়ককে দেখতে যাবার একটি সুযোগ সৃষ্টি হলো। আমরা কজন মিলে পরিকল্পনা করলাম কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাওয়া যায়।

আমি এবং হারুন দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা হাটহাজারী যাব। সাথে আরো কয়েকজন সহপাঠী যেতে রাজি হলো। সবাই মিলে আবু তাহেরের দোকানে গেলাম। চা খেতে খেতে আলাপ চলছিল। কীভাবে অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়া যায়। টাকা জোগাড় করতে হবে বাস ভাড়ার জন্য। আমরা সবাই ছাত্র। হাতে তেমন টাকাও নেই। তবু প্রস্তুত বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার। আমাদের আলোচনা শুনে আবু তাহের আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিল। আবু তাহের মুসলিম লীগের একজন সমর্থক ছিল। তার বাবাও মুসলিম লীগ করতেন। দীর্ঘদিন বার্মায় চাকরি করার পর শেষ জীবনে দেশে ফিরে আসেন। কাজ কর্ম নেই। কাজ করার শক্তিও তার বাবার তেমন ছিল না। রাজনীতির কথা হলে মুসলিম লীগের পক্ষে বলতেন। তাহেরও বাপের অনুসারী বটে। তাহের কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করত না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি তার প্রবল বিদ্বেষ। রাজনৈতিক আলোচনায় তার সাথে এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক হতো। তবে কোনো প্রকার সহিংসতা নয়।

আবু তাহেরের যাবার আগ্রহ দেখে আমরা আপত্তি জানালাম। বললাম 'তুমি মুসলিম লীগের, তোমাকে আমরা আমাদের সাথে নিব না'। আমাদের প্রবল

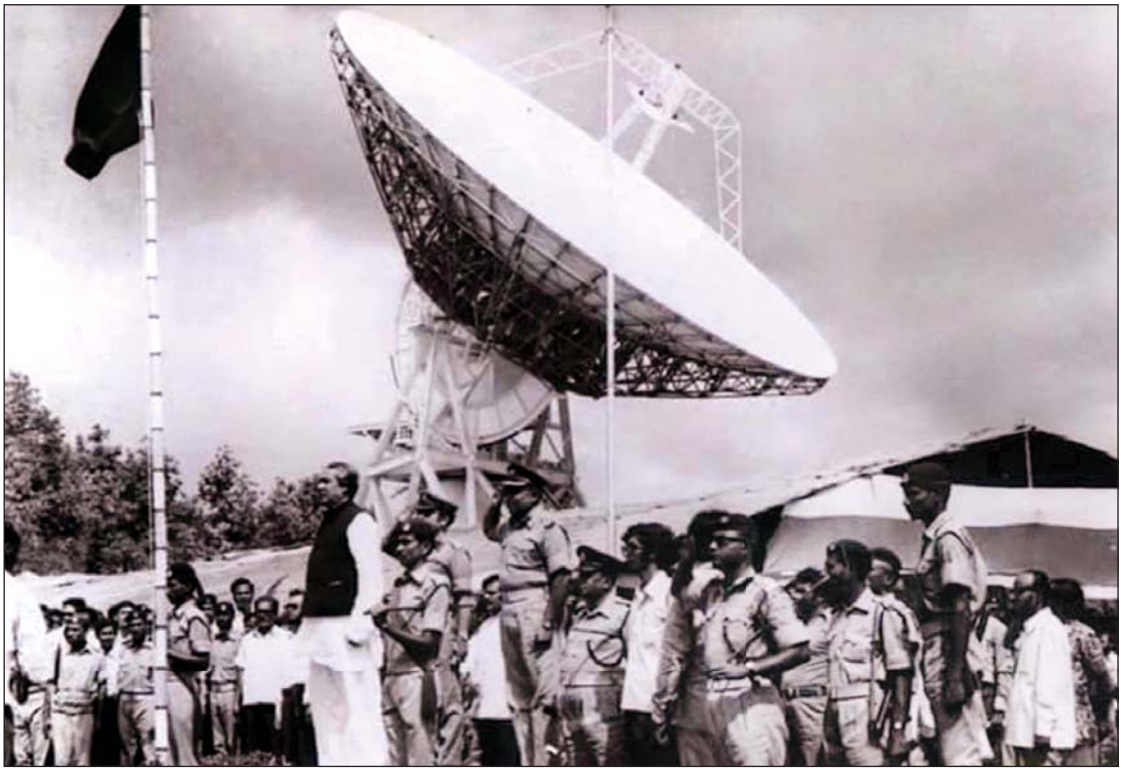

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করছেন- ১৪ই জুন, ১৯৭৫

বিরোধিতা দেখে সে অনুনয়বিনয় করতে লাগল। সে বলল 'আমি অন্তত বঙ্গবন্ধুকে একটু কাছ থেকে দেখতে চাই। দয়া করে তোমাদের সাথে আমাকে নাও'। তার আকুতি দেখে আমরা তাকে সাথে নিতে রাজি হলাম। যাবার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো। পরের দিন সকাল ছয়টায় আমাদের যাত্রা। রওনা দিতে হবে স্কুল ক্যাম্পাস থেকে।

আমাদের অবস্থান হবে হাটহাজারী পার্ব্বতী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। সেখানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিবেন। হাটহাজারী আমাদের গ্রাম হতে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে। ভ্রমণও খুব একটা সহজ ছিল না। ৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ফটিকছড়ি সদর। সেখান থেকে চাঁদের গাড়িতে নাজির হাটবাজার। সেখান থেকে 'উডবডি' বাসে হাটহাজারী। হাটহাজারী থেকে এক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পার্ব্বতী উচ্চ বিদ্যালয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। রাতে খুবই উত্তেজিত ছিলাম বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখব এই ভাবনায়। ছবিতে যাঁকে দেখেছি, রেডিওতে যাঁর বক্তৃতা শুনেছি তাঁকে সামনাসামনি দেখব, কী আনন্দ! বঙ্গবন্ধুকে দেখার আগ্রহে এতটাই বিভোর ছিলাম সকালে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে রওনা দিলাম। স্কুলের মাঠে সকলে জড়ো হলাম। সূর্যটা সেদিন অনেক বেশি উদ্দীপ্ত ছিল। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্য সে বুঝি অনেক দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। আকাশে বাতাসে আনন্দের ঝর্ণাধারা। সকলের অধীর আগ্রহ বঙ্গবন্ধুকে স্বচক্ষে দেখার। সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনার। কারো কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন মনে প্রবল ইচ্ছে আছে। আছে অধীর আগ্রহ। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সকাল ১০টায় হাটহাজারী পার্ব্বতী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পৌঁছলাম। ১৪ই জুন, ১৯৭৫। সকাল ১০ টা। হাটহাজারী পার্ব্বতী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ। লক্ষ জনতার ঢল। চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। এত বিশাল সমাবেশ মনে হলো জনসমুদ্র। সকলের অদম্য

বাসনা বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে একনজর দেখা আর বঙ্গবন্ধুর জাদুময়ী বক্তৃতা শুনা।

অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হয় না। এই বুঝি বঙ্গবন্ধু আসবেন। এগারোটা বেজে গেল। পুরো রাস্তা মানুষের দখলে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই। রাস্তায় লক্ষ মানুষের ঢল। কোনো যানবাহনে চলার সুযোগও নেই। পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দিব সে সুযোগও নেই। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে সূর্যের তেজ আরো তীব্রতর হচ্ছে। অধীর আগ্রহে সকলেরই অপেক্ষা। এই বুঝি বঙ্গবন্ধু আসছেন। 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে মুখরিত পুরো এলাকা। হাজারো মানুষের ঢল। লক্ষ কোটি জনতার সমাগম। হাটহাজারী যেন জনতার এক মহাসমুদ্র।

আমরা যথারীতি পার্ব্বতী উচ্চ বিদ্যালয় গেইটের সামনে দাঁড়ানো। সেখান থেকে একটু দূরে মঞ্চে উঠার সিঁড়ি। হঠাৎ দেখি স্লোগানের তীব্রতা বেড়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম বঙ্গবন্ধু এসেছেন। রাস্তায় কোনো পুলিশ নেই। কোনো বিডিআর নেই। কোনো সিকিউরিটি ফোর্স নজরে পড়েনি। অনেক পথ পায়ে হেঁটে বঙ্গবন্ধু কয়েকজন নেতা কর্মী সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন। গণ মানুষের নেতা, জনতার কাতারে একাকার।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর সামনে যে- পড়ছে তাঁর সাথেই তিনি আলিঙ্গন করছেন। তাঁর কাছে আসতে কোন বাধা নেই, তাঁর কাছে ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ নেই। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত বঙ্গবন্ধু। তিনি নিজে যেমন মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতেন মানুষও তাঁকে পাগলের মতো ভালোবাসত। তিনি যে আমাদের এই দেশ উপহার দিয়েছেন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের এত ভালোবাসা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করার ভাষাও বুঝি কারো নেই। মঞ্চে উঠার প্রাক্কালে হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু। আমরা বঙ্গবন্ধুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদেহী, পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি ও কালো মুজিব কোট পরা সুদর্শন একজন মানুষ। এ যেন স্বপ্ন দেখার মতো। আজ আমাদের জীবন স্বার্থক হলো, স্বপ্ন পূরণ হলো। বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখতে পেয়ে দু'নয়ন আনন্দে ভরে গেল। ভিড়ের ধাক্কায় আমরা ছিটকে পড়লেও আবু তাহের তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের অবস্থান ঠিক রাখল। তাহেরকে সামনে পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তার সাথে আলিঙ্গন করলেন। ভিড়ের মধ্যে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হলেও বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখার সুযোগটুকু পেয়ে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো। ভিড় ঠেলে এক পা-দু'পা এগিয়ে ধীরে ধীরে মহানায়ক মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন। পুরো মাঠ তখন প্রকম্পিত হলো 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে। অবশেষে মহান নেতা মাইক্রোফোন হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেলেন। শুরু হলো বক্তৃতা। 'প্রিয় ভায়েরা আমার, আজ আমি আপনাদের সামনে লম্বা বক্তৃতা দিতে আসিনি। আমার জন্য বেতবুনিয়ায় সবাই অপেক্ষা করছে। নির্ধারিত সময়ে আমাকে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি আবার আপনাদের কাছে আসব। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা'। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে মনে হলো এ যেন ভাষণ নয়, ছন্দে গাথা পংক্তিমালা।

বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। জনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। তবে যত দূর দেখা যায় তত দূর তাঁকে দেখছিলাম পায়ের উপর ভড় দিয়ে। আমাদের যেন অতৃপ্তি রয়েই গেল। আশা ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনব। অনেক লম্বা ভাষণ। সেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মতো 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম...'। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হবে। তাঁর ভাষণ শুনে শরীরের সমস্ত রক্ত টকবগিয়ে উঠবে। আবারও সকলে উজ্জীবিত হব বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশ গড়ার কাজে। তবে ভাষণ সংক্ষিপ্ত ছিল বলেই কেন জানি সবকিছু অতৃপ্তই রয়ে গেল।

সমাবেশ শেষে আমরা রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। সবাই মিলে ভিড় ঠেলে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়িতে আবু তাহেরের অনেক গল্প। আবু তাহের আজ অনেক পুলকিত, গর্বিত, ধন্য। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার 'ঐতিহাসিক আলিঙ্গন'। এ এক দুর্লভ ঘটনা। রীতিমতো মিরাক্যাল। গাড়িতে আবু তাহেরের কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সে আর বিতর্কে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে না।

শুধু বঙ্গবন্ধুর গুণগানই করে চলছে। তার মুখে শুধু বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধু। তার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে আমরাও বিস্মিত হলাম। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার 'ঐতিহাসিক আলিঙ্গনই' হয়ত তার অভাবনীয় পরিবর্তনের কারণ। এ যেন এক পরশ পাথরের ছোঁয়া। রূপকথার সোনার কাঠি রুপার কাঠির মতো, যা স্পর্শ করলেই পরিবর্তন ঘটে। কী এক সম্মোহনী শক্তি যা সব কিছু পরিবর্তন করে দেয়।

বাড়িতে এসে আবু তাহের যথারীতি তার ব্যবসায় নব উদ্যমে মনোযোগ দিল। দোকানে হরেকরকম মানুষের সাথে তার নিত্য যোগাযোগ। এই কথা সেই কথা বলতে বলতেই আলোচনায় আসে বঙ্গবন্ধুর কথা। প্রত্যেক কথায় সে বঙ্গবন্ধুকে টেনে আনে। দেশের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ, রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম করা, আরো কত কী। যার দোকানে এতদিন মুসলিম লীগের নেতাদের ছবি ঝুলত সেখানে শুধুই বঙ্গবন্ধুর ছবি স্থান করে নিল। যারা আবু তাহেরকে আগে থেকে চিনত তারাও তার এই পরিবর্তনে অবাক হলো। তার দোকানে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে–এ সাহস এখন আর কারো নেই। তাহের বুঝি একাই সেটা প্রতিহত করতে যথেষ্ট। মানুষের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশ, প্রতিকূলতায়, প্রকৃতিতে পরিবর্তন অনিবার্য। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলিঙ্গনই তাহেরের এ পরিবর্তন। বঙ্গবন্ধুর আলিঙ্গন যেন এক জাদুর পরশ। তবে তাহেরের এই পরিবর্তন একান্তই বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। জাতির পিতার প্রতি তার অশেষ শ্রদ্ধা। এ ভালোবাসার উৎস পরশ পাথরের ছোঁয়া। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে শুরু হলো তাহেরের নিত্য পথ চলা।

আবু তাহের সকাল ৬টা থেকে তার দোকান শুরু করে। দোকান খুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে চুলায় চায়ের পানি বসায়। তার একটি দামি ট্রানজিস্টার ছিল। তার কাজ সকালবেলা বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা শুনা। দেশ-বিদেশের খবরাখবর নেওয়া। ট্রানজিস্টারের একটি লম্বা অ্যান্টেনা ছিল। সে অ্যান্টেনা দিয়ে তাহের ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবর শুনত। তার কাছে বিশ্বের সব ঘটনার হালনাগাদ বর্ণনা পাওয়া যেত।

শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সাল। ভোরবেলা আবু তাহের যথারীতি দোকানে এসে কাজকর্ম শুরু করল। সবকিছু পরিষ্কার করে চুলায় পানি বসাল। তারপর অ্যান্টেনা তুলে ট্রানজিস্টারে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনল। বিভিন্ন চ্যানেলের খবর শুনতে শুনতে ট্রানজিস্টার থেকে হঠাৎ একটি বার্তা তার কানে বাজল। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত...! আবু তাহের কিছুই বুঝতে পারল না কী হলো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। বার বার মনে হচ্ছিল সে ভুল শুনছে। আবার এদিক-সেদিক ট্রানজিস্টারের কাঁটা ঘুরাতে থাকল। এ বার্তা বার বার প্রচারিত হতে থাকল। আবু তাহের নিজেকে চিমটি কাটল। দেখল তার জ্ঞান আছে কিনা, নাকি অচেতন। ঘটনা শুনে আবু তাহের রীতিমতো বাকরুদ্ধ। 'একি শুনছি আমি'!! 'কী হয়েছে আমার বঙ্গবন্ধুর'!!! আবু তাহেরের আহাজারি। সে চিৎকার করছে আর বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলে বিলাপ করছে। একটু পরপর ট্রানজিস্টারে প্রচার হতে থাকল বঙ্গবন্ধু আর নেই। সাথে পরিবারের সদস্যরাও...

ঐদিন সকালবেলা আমরা সবেমাত্র স্কুলে আসতে শুরু করি। সেদিন আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা ছিল। মনে হলো অঝোরে মেঘের কান্না শুরু হবে। চারিদিকে নীরবতা, নিস্তব্ধতা। যেদিকে তাকাই শুধুই হাহাকার। একি শুনি। বঙ্গবন্ধু নেই-এ যেন অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হলো। মনে হলো এই তো সেদিন বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি দেখলাম। দীর্ঘদেহী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ। যার বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ এখনো মর্মে বাজে। সে মানুষটি আজ নেই। এ কী নির্মমতা, কী নিষ্ঠুরতা। এমন পৈশাচিক ঘটনা ঘটবে সেটা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। চারিদিকে মৌনতা। সকলেই হতবাক, বাকরুদ্ধ। মনে শুধু একটাই প্রশ্ন-একি হলো। এমন বিভীষিকাময় মুহূর্তে একটি মাত্র লোক রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়াচ্ছে। তার কান্নার আহাজারিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। শুধু বিলাপ আর কান্না, এ কান্না যেন বেদনার। এ কান্না যেন স্বজন হারানোর। এ কান্না থামবার নয়। তাহেরের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল 'কোন জানোয়ার আমার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল', আবু তাহেরের বিলাপ এবং আর্তনাদে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হলো। বঙ্গবন্ধুর শোকে আমরাও মুহ্যমান, আমরাও বাকরুদ্ধ, শোকাহত। নরপশুদের ঘৃণার কোনো ভাষা নেই আজ। এমন পৈশাচিক জঘন্য ঘটনা, যেখানে মানবতা বিপন্ন। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা আজ আমাদের মাঝে নেই। এ তো ভাবাই কঠিন। আবু তাহেরের কান্না বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। এ কান্না মহান নেতার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। এ কান্না আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। এ কান্না ঘাতকদের প্রতি আমাদের চরম ঘৃণা, তীব্র প্রতিবাদ।

আমরা সকলে তাহেরের দোকানে একত্রিত হলাম। ট্রানজিস্টারের সামনে সবাই বসে পড়লাম। ঘটনার কারণ জানতে চেষ্টা করলাম। যে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক কিছুই করার সাহস পায়নি সে বঙ্গবন্ধুকে ঘাতক বেঈমানের দল, স্বার্থপর কাপুরুষেরা রাতের আঁধারে বুলেট বিদ্ধ করবে, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ধিক্ সে কুলাঙ্গারের দলকে। ধিক্ সে মানবতার শত্রুকে।

নির্বাক দৃষ্টিতে আমরা সেই আবু তাহেরের ট্রানজিস্টার নিয়ে বসেছিলাম তার ছোট্ট চায়ের দোকানে। বেদনায় বিষণ্ন মন সকলের। মনে হয় হাজার টনের পাথরে বুক চাপা পড়েছে। মনে পড়ে এই তো সেদিনের স্মৃতি, হাটহাজারী পার্ব্বতী স্কুল মাঠ। সাদা পাঞ্জাবি, কালো মুজিব কোট পরা দীর্ঘদেহী সে মানুষটি। কী দৃঢ় তাঁর ব্যক্তিত্ব। মনে পড়ছে হাজারো জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আলিঙ্গন। দরাজ গলার সেই ভাষণ। ধনী-গরিব, হিন্দু মুসলমান, যিনি ভেদাভেদ করতেন না মানুষকে বুকে টেনে নিয়ে আপন করা সে মানুষটি। মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন যিনি। যার ছোঁয়ায় মানুষ সম্মোহীত হয়। যার জাদুকরী বক্তৃতায় মানুষ হয় আবেশিত। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি থাকবেন মানুষের মণিকোঠায়, বছরের পর বছর, হাজার কোটি বছর। ■

‘ভ্যাকসিন হিরো’
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বাংলাদেশে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘ভ্যাকসিন হিরো’ সম্মাননায় ভূষিত করেছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)। ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন জিএভিআই বোর্ডের সভাপতি এনগোজি অকোনজো আইয়েলা।

বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির ব্যাপক সফলতা, বিশেষ করে পোলিও নির্মূল এবং ডিপথেরিয়া, হেপাটাইটিস বি ও রুবেলার মতো মরণব্যাধি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখায় শেখ হাসিনার প্রশংসা করে এ পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুরস্কার দেওয়ার আগে প্রশংসাপত্র পড়ে শোনান এনগোজি ওকোনজো আইয়েলা। এসময় তিনি বলেন, এ পুরস্কার তাদের জন্য, যারা শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য জরুরি টিকাদানে উদ্যোগী হয়েছেন এবং কোনো শিশু যাতে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে কাজ করেছেন। তিনি আরো বলেন, ‘শুধু টিকাদান কর্মসূচি নয়, শিশু অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নেও শেখ হাসিনা একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন।’

সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক সংস্থা জিএভিআই, যা ভ্যাক্সিসিন অ্যালায়েন্স নামে পরিচিত, যারা বিশ্বে কোটি কোটি শিশুর জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখছে টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কঠোর পরিশ্রম এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়ে আমরা বরাবরই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ পুরস্কার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ’ সম্মাননা দিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা (ইউনিসেফ)। তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসামান্য স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানজনক এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইউনিসেফ ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েত্তা ফোর।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনয়েটা ফোর বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূয়সী প্রসংসা করে বলেন,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন সেক্টরে উন্নতি করেছে। এছাড়া, মিয়ানমারে নিপীড়নের শিকার ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কার প্রদানের জন্য ইউনিসেফকে ধন্যবাদ জানান। এ সম্মাননা পাওয়ার পর তিনি এই পুরস্কারটি দেশবাসী এবং বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের শিশুদেরকে উৎসর্গ করেন।

সম্ভাবনা পূরণ না করে জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন একটি তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের প্রতি অব্যাহত সমর্থন রাখায় ইউনিসেফকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবসময়ই বাংলাদেশের পাশে ছিল ইউনিসেফ। ■

তিনি বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তাই তরুণদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইউনিসেফের দেওয়া এ স্বীকৃতি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সম্মান আমার একার নয় এটি সমগ্র বিশ্বের। জাতি গঠনে বাংলাদেশের তরুণদের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের যুবসমাজ জাতির সমস্ত সংকটে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুবকদের

‘সুস্থ-সবল শিশুরা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুস্থ নতুন প্রজন্মই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধি সোনার বাংলা গড়বে।’

— প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কবিতা

ইচ্ছে করে

তানজিন দেলওয়ার খান (রিজ)

উচ্চৈঃস্বরে বারে বারে
মা দিচ্ছেন ডাক
আয়রে খুকু ঘরে আয়
এখন খেলা রাখ।

কিন্তু খুকু ডাক শুনে না
উদাস যে তার মন
দেখছে চেয়ে দুলছে হাওয়ায়
দূরে কাশের বন।

কাশের বনে ডাকছে পাখি
এই বিকেল বেলা
পথের ধারে গাছগাছালি
শত শোভার মেলা।

মা কেন ডাকে এত
পড়ায় দিতে মন
খুকুর শুধু ইচ্ছা করে
খেলতে সারাক্ষণ।

১০ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

বৃষ্টি

মো. জাওয়াদ হোসেন

রিমঝিম বৃষ্টি পড়ে
গাছের পাতা নড়ে চড়ে
খোকা খুকি মনের সুখে
পুকুর জলে লাফিয়ে পড়ে।

বৃষ্টির জলের ফোঁটা
যখন অঝোর ধারায় ঝরে
হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিলে
মনটা কেমন করে।

৮ম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল, মাভা, ঢাকা।

মানুষ

রোকসানা গুলশান

মেধা নয় জ্ঞান নয়
আগ্রহে বাড়ো,
ধুলোবালি অন্যায়
মন থেকে ঝাড়ো।

সত্য ও সুন্দর
থাকে যদি মনে
ঝগড়া না করে সে
মেলে প্রতি জনে।

সততা ও সাহসে
হও যে বড়ো,
নিয়মিত মন দিয়ে
বইকে পড়।

তবেই তো হবে তুমি
মানুষ একজন।
মানুষ হওয়া সব থেকে
আগে প্রয়োজন।

শুভ সকাল

সালাম ফারুক

বৃষ্টিভেজা শুভ সকাল
দিনটা সবার যাক ভালো
মেঘলা আকাশ যত আঁধার
জীবন তত হোক আলো।

দিনটারে আজ করো রঙিন
সাজো সবে মনের মতো
সব বাধা যে যাবে সরে
সত্য জেনো চিরায়ত।

চারপাশেরই মানুষগুলো
হয়ে উঠুক বন্ধু-স্বজন
দেখবে জীবন চলছে ছুটে
শত্রুরা সব করবে রোদন।

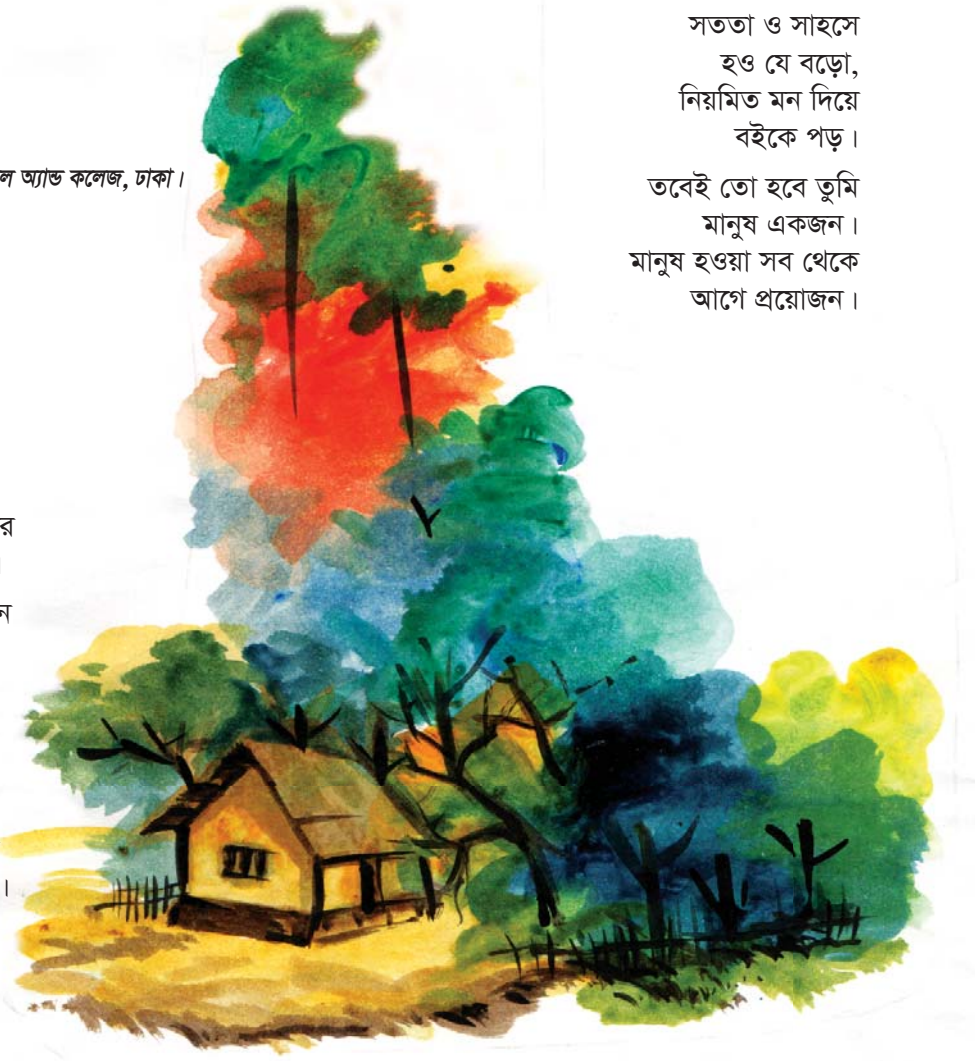

কথার মূল্য

মোসা. তানিয়া আক্তার

একবার এক মহাজন একজন কৃষককে কিছু টাকা ধার দিলো। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ায় কৃষক সঠিক সময়ে টাকা পরিশোধ করতে পারল না। তাই কৃষকের ঋণ সুদে-আসলে অনেক বেশি হয়ে গেল। একদিন সেই পাওনাদার কৃষকের বাড়িতে টাকা চাইতে আসলো। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না শুধুমাত্র একটি ছোটো ছেলে আঙিনায় খেলছিল।

'তোমার বাবা-মা কোথায়?' পাওনাদার ছোটো ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু ছেলেটি কোনো কথা না বলে খেলতে থাকল।

পাওনাদার বলল,

'আমি জিজ্ঞেস করছি তোমার বাবা-মা কোথায়? যদি তুমি এমন জেদ করেই থাকো তাহলে আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

ছেলেটি বলল, 'আমার বাবা ছোটো গাছকে বড়ো করতে গিয়েছে। আর আমার মা গিয়েছে হাওয়া বিক্রি করতে।'

পাওনাদার অনেকক্ষণ ভাবল ছেলেটি কী বলল তার কিছুই বুঝতে পারল না। অবশেষে সে ছেলেটিকেই বুঝিয়ে বলতে বলল।

সঠিক উত্তর পাওয়ার আশায় পাওনাদার লোকটি চালাকি করে ছেলেটিকে বলল, 'তুমি যদি সত্যি কথা বলো তাহলে তোমার বাবার সব ঋণ আমি মাফ করে দিব'।

'আপনি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন।' ছেলেটি

বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তর দিলো।

'মোটেই না, আমার কথার একটি মূল্য আছে।' পাওনাদার তাকে আশ্বস্ত করল।

'তাহলে আপনি যে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন সেটির সাক্ষী কে হবে?' ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

পাওনাদার বলল 'টেবিলের প্রান্তে যে টিকটিকিটি হামাগুড়ি দিচ্ছে সেই-ই হবে সাক্ষী।'

'ঠিক আছে তাহলে বলছি। আমার বাবা ধানগাছের চারা রোপণ করতে গিয়েছে আর আমার মা গিয়েছে পাখা বিক্রি করতে।' ছেলেটি উত্তর দিলো।

এর কিছুদিন পর সেই মহাজন তার দেওয়া কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ছেলেটির বাবার কাছে টাকা চাইতে আসলো।

'বাবা এখন আর তোমার তার কাছে কোনো ঋণ নেই। সেদিন তিনি আমাদেরকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেছেন।' ছেলেটি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে তার বাবাকে বলল।

'হতভাগ্য মিথ্যেবাদী'- মহাজন গর্জন করে উঠল

'ভুলে যেও না আমার একজন সাক্ষী আছে' ছেলেটি মুচকি হেসে বলল।

মহাজন তখন আদালতে গেল অভিযোগ করতে। 'আমি আমার ঋণের বিষয়টি অস্বীকার করছি না স্যার কিন্তু আমার ছেলেটিকে ভদ্রলোক কথা দিয়েছেন যে তিনি আমাদেরকে ঋণমুক্ত করে দিয়েছেন।' কৃষক তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে বলল।

ম্যাজিস্ট্রেট ছেলেটিকে ডাকলেন এবং সেদিন কী ঘটেছিল তার সব বলল। 'তুমি যা দাবি করছো তার স্বপক্ষে তোমার কী কোনো প্রমাণ আছে?'- ম্যাজিস্ট্রেট ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার একজন সাক্ষী আছে স্যার'- ছেলেটি বলল।

'মিথ্যেবাদী'-মহাজন চেঁচিয়ে উঠল।

'স্যার যে টিকটিকিটি সেদিন আমাদের ঘরের দেয়াল বেয়ে উঠেছিল সেই সাক্ষী'- ছেলেটি বলল। মহাজন বলল, 'স্যার সে মিথ্যে বলছে। এই টিকটিকিটি টেবিলের এক প্রান্তে ছিল ঘরের দেয়ালে নয়।'

ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন এবং বললেন। 'বোকা মহাজন। তুমি নিজেই নিজেকে প্রতারিত করেছ। এখন যে চাবুক তোমাকে মারা হবে, তা থেকেই তুমি শিক্ষা পাবে কীভাবে কথা দিয়ে কথা রাখতে হয় এমনকি একটি ছোটো ছেলের সাথেও।' ■

পাখি মামা ও শামুকখোল

দিলারা মেসবাহ

প্রিয় পাখি মামার সঙ্গে আজ ছোটো বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেব, কেমন? মামা আমাদের কাজের মানুষ, মজার মানুষ! রসিক মানুষও বটে। মামার কথা মিছরি রসে ভরা। এত এত বিষয়–ভাবনা তার মনে জলছবির মতো আঁকা থাকে-অবাক হতে হয়! মামা গাছগাছালি, নদনদী, পাখপাখালির যাবতীয় খবরাখবর রাখেন। বিশেষ ভালোবাসা তার পাখিগুলোর জন্য। কী বলব পাখপাখালির নামধাম সব তার জানা, যাকে বলে ঠোঁটস্থ।

সুনামগঞ্জের হাকালুকি হাওর- আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো হাওর! শীতে এই হাওরে পাখিদের মেলা বসে। শীত মৌসুমে মামা পাখিদের চোখ জুড়ানো ঐ সব পাখিমেলা দেখে বেড়ান। শুধু দেখেনই না পরখও করেন, ফ্রেমে বন্দি করে আনেন। নতুন নতুন তথ্য জোগাড় করেন মামা।

আমাদের জিগাতলা মহল্লার পাখি মামাকে যে চেনে না সে কিছুই চেনে না। আকাশ-বাতাসও জানে! বদিউজ্জামান মীর্জার বাড়ি কোনটা বললে এ তল্লাটে ছেলেবুড়ো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কিন্তু যদি বলো পাখি মামার কোন বাড়ি? তাহলে সক্কলে আঙুল উঁচিয়ে হইহই করে বলবে, ঐ যে হলুদ বাগান বিলাস লতানো লাল বাড়িটা। বাড়ির নাম জলপিপি। আমাদের মহল্লার বিল্লাল কনফেকশনারির হুজুরালি চাচাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় খানিক বেশি। দোকানি মানুষ, দোকানে একঠাঁয় বসে বেচা বিক্রি করে রাত আটটা-নয়টা পর্যন্ত। মাঝেমধ্যে ডিম, নুডুলস বিক্রির টাকা গুণতে গুণতে হয়রান হুজুরালি চাচা। ওদিকে চার-পাঁচজনের দলটি তার মুখের দিকে চেয়ে উৎসুক হয়ে থাকে। ঐ একই প্রশ্ন-পাখি মামার বাড়িটা কোনদিকে একটু বলবেন? কপালে ভাঁজ ফেলে চাচা বলেন-ঐ তো, লাল রঙের বাড়িটা একটু আগায়া যান না মিয়ারা। পক্ষী বিশারদ ঐ বাড়িত থাহেন। থাহেন আর কুথায়? দিন-রাইত কান্দে একখান ঝোলা ঝুলাইয়া পাক-পক্ষীর চৌদ্দগুষ্টির হদিস খোঁজেন। আউলাবাউলা কিসিমের পাগলা মানুষ। তয় মনডা ভালো।

তারপর বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গেই কথা বলেন হুজুরালি চাচা। ভালো চাকরি পাইছি একখান। য্যানবা নবাব সেরাজদৌলা! বিরাট বিদ্যান। পক্ষী আকাশে উড়ব চায়া চায়া দেখব। কোকিলায় কুহু কুহু ডাকব, শুনমু ক্যান খুইল্যা। এইডার ভিতরে আবার গবেষণার থাকল কী? পাগল-ছাগলের কারবার। খায়াদায়া আর কোনো কাম কাইজ নাইকা?

মহল্লায় একটা পাঠাগার আছে, সেখানে কিনা শিশু-কিশোরদের বইপুস্তক বেশি। বড়োদের সাহিত্যও আছে, তবে কিশোরদের তুলনায় কম। ছুটির দিনগুলোতে আমরা লাইব্রেরিতে বই পড়ি। মন্টু, বাদল, চিন্টু পড়ে কম, কথা কয় বেশি। মাঝে মধ্যে চিল্লাপাল্লা করে খামোখা। এই ত্রিরত্ন সাপলুডু খেলে। কোক, পিৎজা খায়। সস ফেলে টেবিল নোংরা করে। পাখি মামা একদিন তো কান মলেই দিয়েছিলেন মন্টুর। বার বার বলেছেন ঐ সব রঙিন পানীয়, ফাস্টফুড খাবে না। ওসবই শরীরের জন্য বিষ।

মামার এ বছরের টার্গেট শামুকখোল পাখি। বলে রাখি এই পাঠাগারের মূল কারিগর পাাখি মামা। তিনি এ দেশের বড়ো মানের সাংবাদিক। একবার অনেকগুলো শামুকখোল পাখি উদ্ধার করেন মামা। একটা চোয়াড়ে চেহারার লোক অতগুলো পাখি বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছিল হাতিরপুল বাজারে। মামা ঐ সময় তার দিনলিপি পত্রিকার অফিসে যাচ্ছিলেন। চোখে পড়ামাত্র রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ধাপ করে ধরে ফেললেন ছয়টা শামুকখোল পাখির ঝুলন্ত ছয় জোড়া পা।

সবচেয়ে করুণ বিষয় হলো পাখিগুলোর চোখ ধারালো শলা দিয়ে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। যেন ওরা দিক ঠাহর করে উড়ে পালাতে না পারে। মামা ঐ লোকটিকে আচ্ছামতো বকা দিয়েছিলেন। লোকটা শেষমেষ কান ধরে কসম করেছিল জীবনে আর পাখপাখালি শিকার করবে না, বেচাবিক্রিও করবে না। কিছু টাকা দিয়ে পাখিমামা সেই অন্ধ শামুকখোল পাখিগুলোকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কোথা থেকে শামুকও জোগাড় করে আনলেন। তারপর জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে

কানাইপুকুর পাড়ে তার বন্ধু মজনু মিয়ার জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওখানে নাকি শামুকখোল পাখির অভয়াশ্রম আছে।

আমি, বিপিন যেতাম মামার লাল দালানের চওড়া বারান্দায়। অন্ধ পাখিগুলোকে দেখে কী যে মায়া হতো। কী লম্বা ঠোঁট ওদের। প্রতি বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শীত মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি উড়ে আসে। সাইবেরিয়া ও আরো কোনো কোনো দেশ থেকে। যখন ওদের বসত অঞ্চলে কনকনে শীত পড়ে আর খাদ্যকণার দারুণ অভাব হয়। সহনশীল আবহাওয়ার এই বাংলাদেশের জলাশয়গুলো মুখর হয়ে ওঠে অতিথি পাখিদের কিচিরমিচিরে।

সুনামগঞ্জের হাকালুকি হাওর-আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো হাওর! শীতে এই হাওরে পাখিদের মেলা বসে। শীত মৌসুমে মামা পাখিদের চোখ জুড়ানো ঐ সব পাখিমেলা দেখে বেড়ান। শুধু দেখেনই না পরখও করেন, ফ্রেমে বন্দি করে আনেন। নতুন নতুন তথ্য জোগাড় করেন মামা। এই হাওরে নাকি ৮০-৯০টার মতো বিল আছে। মামা বলেছেন, কিশোর পাঠাগারের বন্ধুদের হাকালুকি হাওর দেখতে নিয়ে যাবেন।

টাঙ্গুয়ার হাওর, আলির হাওড়, কাউয়া দিঘি হাওড়, নলুয়ার হাওর, ছাইয়ার হাওর, ডাকের হাওর, তল্লার হাওর আরো কত যে হাওর-বাঁওড় আমাদের। মামার গল্পকথায় চোখের সামনে ধু ধু হাওরের ঢেউ টলমল করে। হাওরের মাছ নাকি খুবই সুস্বাদু। আবার নাটোর-পাবনার চলনবিলের হদিস পাখি মামার চেয়ে কে বেশি জানে। পাখপাখালি, হাওর, বাঁওড়, গাছগাছালি মামার প্রাণের বিষয়-আশয়। নিয়মিত তার তথ্যময় দারুণ সব নিবন্ধ নানা পত্রিকায় ছাপা হয়। তার কয়েকটি গ্রন্থও আছে পাখপাখালি নিয়ে।

দেখো বন্ধুরা, কথা হচ্ছিল শামুকখোল পাখি নিয়ে। চলে গেলাম কিনা হাওরে, বাঁওড়ে। এ রকম হয়!

এই আমাদের দেশ। একাত্তরে শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি আমার বাংলাদেশ। গাছগাছালি,

পাখপাখালি নদনদীর অভাব নেই। যদিও আগের মতো কী শোভা কী মায়াগো নেই। মুরুব্বিরা বলেন। পাখপাখালি, বৃক্ষলতা, হাওর, বাঁওড়, নদনদী, ঐ নীল আসমান, সোঁদা গন্ধময় মাটি আর ঝিরিঝিরি বাতাস কেউ কারো হাত ছাড়ে না। তারই মধ্যে জনমানুষ আমরা ছুটতে থাকি। ভুলেই যাই আজও এত সুন্দর আমার দেশ। পাখি মামা এসব কথা আমাদের সহজ করে বুঝিয়ে বলেন।

একদিন কিশোর পাঠাগারের আড্ডায় পাখি মামা শোনালেন শামুকখোলের কথা। বিপন্ন এই পাখির অভয়াশ্রমের কথা। সারস জাতীয় এই সুন্দর পাখি অনেক বিপদে আছে। তবু নির্জন জলাশয়ের কিনারে, যেখানে পুরানো ঝোপালো অশ্বত্থ গাছের আশ্রয় পায় সেখানেই বাসা বাঁধে। নিরাপদ আশ্রয় আর খাবার পেলে সেখানেই বিশাল কলোনি বানিয়ে ছাড়ে। বাসা বদল করে না। খুব বিপদে না পড়লে।

পাখিদের টানে গ্রামগঞ্জের অভয়ারণ্য নিজ চোখে দেখতে ছোটেন মামা। ঝোপালো গাছে শামুকখোল বা শামুকভাঙার কলোনির শোভা দেখতে। শুনেছি মামার গল্পে এরা ধানক্ষেতের পোকামাকড় খায়। তাতে কৃষকের উপকার হয়। কীটনাশক ছড়াতে হয় না ক্ষেতে। শামুকভাঙার প্রিয় খাবার তালিকায় রয়েছে শামুক। এরা পানির তলের শামুকের খোল লম্বা ধারাল ঠোঁট দিয়ে ভাঙে। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে গপ গপ করে গিলতে থাকে, তুলতুলে শামুকের মাংস। এই পাখিকে শামখোল, শামুকভাঙা নামেও ডাকা হয়। বেশ বড়োসড়ো জলচর শামখোল। কানাইপুকুর পাড়ে সহজ-সরল গ্রামবাসীরা আদরে ভালোবাসায় আশ্রয় দিয়েছে। পাখি শিকারিদের তারা দলবেঁধে বাধা দেয়। কখনো মারামারি ঝগড়াঝাঁটিও হয়। লোভী পাখি শিকারিরা উৎসব করে পাখির মাংস খায়। হাটেবাজারে বিক্রি করে টাকা রোজগার করে। কানাইপুকুরে আরো অনেক পাখি ঘর বেঁধে নিরাপদে থাকে। কানি বক, পানি-কাউর ইত্যাদি। শামুকভাঙা মূলত দুই রকমের হয়। এশীয় সাদাটে রঙের। আর আফ্রিকানগুলো কালচে বর্ণের।

পাখি মামা গত বছর চুয়াডাঙার বেলগাছি গ্রামে এ পাখির অভয়াশ্রম দেখে মহাখুশি হয়েছিলেন। মামা খুশি খুশি সুরে বলেছিলেন, জানিস তোরা ওখানে বেলগাছি যুবসংঘ আছে। গ্রামের শিক্ষিত ছেলেরা বেশ উদ্যমী। ওখানে গিয়ে আমার তো চক্ষুস্থির। বিশাল বিশাল ডানা পতাকার মতো উড়িয়ে কী আহ্লাদে শামখোল এ ডালে সে ডালে ওড়ে।

বেলগাছির পাখিপ্রেমী গ্রামের মানুষজন গাছের ডালে মাটির কলসি, ভাঁড়, বাঁশের ঝুড়ি, শক্ত করে এঁটে দেয়। যাতে পাখিরা ওর মধ্যেই আরাম করে ঘর বাঁধতে পারে। বেলগাছি গ্রামের তরুণরা ক্যাম্পেইন করে, সাইকেল র‍্যালি করে। প্রথম প্রথম অনেকেই হাসিঠাট্টা করত, আস্তে আস্তে বুঝদার হয়েছে।

নওগাঁ শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে আলীদেওয়া গ্রামে পাখপাখালির নিরাপদ ঘর-গেরস্ত। বাঁশ ঝাড়ে বাসা বেঁধেছে কয়েক জাতের বক, পানকৌড়ি। কালী মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে কয়েক জাতের বক, পানকৌড়ি।

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের মহামায়া হ্রদে শামুকখোল পাখির মেলা। বগুড়ার বিহারহাটের অশ্বত্থ গাছে প্রায় ৪০০ পাখি শামুকভাঙা বিরাট রাজত্ব গড়ে তুলেছে। চিরশত্রু চিল, বাজপাখি এলে ঝাঁক বেঁধে ধাওয়া করে।

পাখি মামা জাতশিল্পী, বাবুই পাখির খুব ভক্ত। তাল, নারকেল গাছেই সাধারণত বাবুই বাসা বানায়। খড়, কাশবনের লতাপাতা দিয়ে মহান শিল্পী পাখি তার অপরূপ বাসা বানায়। ঝড়ো বাতাসে দোল খায় বাসা। কিন্তু খুলে পড়ে না। বাবুই পাখি রাতে জোনাকি পোকা গুঁজে রাখে। জোনাকির আলো ওদের হারিকেন বাতি। আবার সকাল হলে ছেড়ে দেয়। কী সততা ওদের, তাই না বন্ধুরা। মামা মাদারিপুরের মাইজপাড়া গ্রামে বাবুই পাখির নিরাপদ আস্তানা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। মামা যতবার গ্রামেগঞ্জে পাখির অভয়াশ্রম দেখতে যান ততবার তিনি ক্যামেরায় অসংখ্য ছবিও তুলে আনেন। আমাদের দেখান। আর তার সাথে বর্ণনা। যেন চোখের সামনে সব দেখা যায়। কী যে আনন্দ হয় আমাদের।

সৈয়দপুরের গ্রাম ভাগতপুরে বাদুড় রক্ষা কমিটি হয়েছে। হাজারে হাজার বাদুড় দিনভর ঝুলে থাকে গাছের ঘন পাতার আড়ালে। রাতে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদুর কিচিরমিচির করে বের হয়, খাবার খুঁজতে। বাদুড় চোখে দেখে না। কিন্তু ওদের শ্রবণশক্তি দারুণ প্রখর।

বন্ধুরা, একবার আমেরিকার অস্টিনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা সবাই মিলে বড়োসড়ো একটা বোটে

করে নদীর মাঝপথে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ব্রিজটার নিচ থেকে সন্ধ্যায় হাজারে হাজার বাদুড় উড়ে যায় দিগ্‌বিদিক। ওদের খাবার খুঁজে বেড়ানোর সময়। সেই দৃশ্য দেখার জন্য বিদেশিরা আকুল হয়ে অপেক্ষায় থাকে। হঠাৎ আমার কী হলো! যেন পাখপাখালির তুমুল কলকাকলি শুনতে পেলাম। কত জাতের কুবকুব, পিউ পিউ, কুই কুই টুই, কা কা, হুম হুম! বড়োসড়ো শামুকখোলের উড়ন্ত পাখনাগুলো চোখের সামনে দোল খেতে লাগল। যেন আমার প্রিয় ঘুড়িগুলো।

কত পাখি, কত রং, কত বিচিত্র ছবি। পাখিরা আমাদের নীলাকাশের পরম আত্মীয়। ছোটোকালে পড়েছি- পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।

কিছু কথা বাকি রয়ে গেছে। বলে শেষ করি, কেমন? আমাদের মহল্লার গনিমিয়া, করিমালি চাচা রোজ খানিকটা বেলা উঠলে এক ঝাঁক মোরগ-মুরগির পা কষে বেঁধে মাথা ঝুলিয়ে ফেরি করে। কী নিষ্ঠুর ওরা। আগে এতটা খেয়াল করিনি। পাখি মামা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন। এটা রীতিমতো দণ্ডনীয় অপরাধ। পশুপাখির জন্যে আইন রয়েছে শুনলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁস-মুরগি, পাখি মাথা ঝুলিয়ে ওরা হাঁকতে থাকে মু-র-গি-ই। কিন্তু ওদের কত কষ্ট হয়। মানুষ বোঝে না।

ফাঁদ পেতে, গুলি করে– পাখি, হরিণ ইত্যাদি শিকার করা বড়ো ধরনের অপরাধ। আগের দিনে কোনো কোনো বনেদি বাড়িতে বিয়েতে উৎসবে গরু-খাসির পাশে পাখির মাংসের সুদৃশ্য বোল শোভা পেত। প্রাণীজগৎ বৃক্ষলতা ইচ্ছেমতো নিধন করলে প্রকৃতিও আমাদের উপর ফুঁসে উঠবে। পাখি মামা এত সহজ করে মিষ্টি করে এসব জরুরি বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেন।

শামুকখোল, কানিবক, পানকৌড়ি, বালিহাঁস, চড়ুই, শালিক ওরা সবাই আমার পাখি বন্ধু। তোমারও কিন্তু। পাঠ্যবই-এ এত কিছু লেখা থাকে না। পাখিদের ভালোবাসো, ওদের প্রভাতি গান তোমার সারাটি দিন আনন্দে ভরিয়ে দেবে। ■

তাহসিন জায়েদিন খান জাওয়াদ, ৩য় শ্রেণি, ওরিয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

গল্প

কাকের বনবাস

শামীমা জাফরিন

প্রতিদিন ঝগড়াঝাঁটি আর ভালো লাগে না। একে তো ছোটো বাসা তার উপর চার ভাইবোন আর মা-বাবাকে নিয়ে মোট ছয় জন। এত ছোটো বাসায় চার ভাইবোন কোনোমতে গাদাগাদি করে শোয়া। মা-বাবা তাদের গাছের ডালে বসে রাত কাটায়। তার উপর আবার ক্ষুধার জ্বালা, কত আর সহ্য করা যায়। পুরানো টাউনের এক ছোটো চিপা গলির ধারের বাড়িতে একটি আমগাছে তাদের বাসা। সকাল না হতেই হাজারো কাকের কা-কা শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম। যে গাছটায় তাদের বাসা সে গাছটায় আরো হাজার হাজার কাকের বাসা। কোথাও একটু বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। মানুষের বাসার ছাদেও শান্তি নেই। ছেলে-মেয়েরা দেখলেই দৌড়ে তেড়ে আসে। খাবারের খোঁজে খুব ভোর হতেই বের হয়ে পড়তে হয়। শহুরে জীবন

সাংঘাতিক প্রতিযোগিতার, কষ্টের, খরচের। সকাল সকাল বের হতে না পারলে কপালে সারাদিন ঘুরেও খাবার জুটতে চায় না। সেদিন ড্রেনের ময়লা খেয়ে কোনোমতে দিন কাটাতে হয়। কী বিশ্রী স্বাদ সে খাবারের তবুও খেতে হয়।

চার ভাইবোনের মধ্যে ছোটো কাক ছানাটি একটু ভাবুক স্বভাবের, মানুষ হলে নিশ্চয়ই সে কবি কিংবা শিল্পী হতো। তার নাম ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। কিন্তু কপালের কারণে সে জন্মেছে কাক ছানা হয়ে।

কাক ছানাদের গায়ের পশম হয়ে বড়ো হয়ে গেলে তাদের নিয়ে তাদের বাবা-মা গেল একটু দূরের ছাদে। এভাবে আস্তে আস্তে একটু করে দূরে নিয়ে যেতে লাগল। আর এভাবেই একদিন তারা নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছোট্ট কাক ছানার শহরের এত মানুষ, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় কিছুই ভালো লাগে না। শহুরে জীবনে কোনো মায়াদয়া নেই। সবাই শুধু ঘুরে বেড়ায়। এসব তার একদম ভালো লাগে না। দম আটকে আসে। সে এ ধরনের অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। আর শহুরে চাকচিক্য দেখে মনে হয় মানুষের কোনো অভাব নেই। পাশেই বস্তিতে, ফুটপাতে মানুষের কষ্ট দেখে তার চোখ ফেটে পানি আসে। পাশ দিয়ে কত গাড়ি করে লোকজন চলে যায় কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

একদিনের একটা ঘটনা তার মনে খুব কষ্ট দিয়েছিল। সেটা সে জীবন থাকতে ভুলবে না। বাসায় জায়গা হয় না বলে সে দূরে একটা বাসা নিয়েছে, সেদিন সারা-দিন যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল রাস্তার পাশে একটি ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে ক্ষুধায় কাঁদছিল। তাদের ঘরে কোনো খাবার ছিল না। পাশে তার দরিদ্র বাবা-মা অসহায়ের মতো বসেছিল। কাকটার পেটেও তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলছিল। সে তার বাসার কাছেই একটি ডাস্টবিনে পলিথিন ব্যাগ ছিঁড়ে কিছু জুঠা খাবার খাচ্ছিল, তার দেখাদেখি আরো কিছু কাক কা-কা করে এসে তার পলিথিন ছিঁড়ে টেনে সবাই মিলে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছিল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নেংটা সেই ছেলেটি দেখে কাঁদছিল।

সেদিনই বাসায় গিয়ে কাকটা ভাবল নাহ এখানে এ শহরে আর নয়, শহরে থাকলে এভাবে একজনের খাবার সবাইকে কাড়াকাড়ি করে খেতে হবে। এত লোকের ভিড়ে জীবন অতিষ্ট। যখন বার বার বস্তির সেই ছেলেটির মুখ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু সে যে কাক কি করার আছে ছেলেটির জন্য। যাদের করার আছে তারা তো পাশ দিয়ে চলে যায়, বৃষ্টি হলে বসে মজার মজার খাবার খায়। সে ঠিক করল না সে গৃহত্যাগী হবে। শহর ছেড়ে একবারে বনবাসে চলে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। একদিন খুব সকালে সে নিজের ঘরের মায়া ছেড়ে কোনো কিছু সাথে না নিয়ে রওনা দিলো বনবাসের উদ্দেশ্যে।

নাহ্, এত মানুষের ব্যস্ত শহরে আর নয়। এত মানুষের শহরটা যেন পচে গেছে। উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে যেয়ে বসল অনেক দূরে একটা নিমগাছের ডালে। খুব ক্ষুধাও লেগেছে, ভেবেছে একটু জিরিয়ে নাস্তা খেয়ে পরে বনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে। একেতো নিমগাছ তার মধ্যে খাওয়ার কিছু নেই। এই অচেনা, অজানা জায়গায় এসে কাক পড়ল ভীষণ চিন্তায়। একটু দূরে আর একডালে শালিকের কিচকিচ শব্দ শুনতে পেয়ে একটু এগিয়ে গেল কাক। প্রথমেই শালিকের কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। কাক ও শালিকের মধ্যে কুশলাদি বিনিময় হওয়ার পর কাক-শালিকের খাবারের কথা জিজ্ঞেস করল। কোথায় খাবার পাওয়া যায়।

এখানে আছি স্বাস্থ্যটা ভালো আছে। নিমগাছে আছি বলে নিরোগ আছি নিমের হাওয়া খেয়ে, তবে খাবার জোগাড় করতে হয় একটু কষ্ট করে। ক্ষেতের পোকামাকড় খেয়েই আমার চলে যায়। শালিক কাক ছানাকে বলল, আপনার জন্য এসব খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা একটু কষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আবার এসেছেন শহর থেকে। আপনার মুখে এ সমস্ত গ্রাম্য খাবার ভালো নাও লাগতে পারে।

না-না ভাই শালিক, তুমি আমাকে শহুরে বলে লজ্জা দিবে না। আমি খুব সাধারণ এবং কোলাহল মুক্ত জীবনযাপন করার জন্যই শহর ছেড়ে গ্রামে চলে এসেছি। শহরে থাকতে থাকতে আমার একদম হাঁফিয়ে উঠার উপক্রম হয়েছিল। এখানে আছো ভাই খুব আরামে। অল্প খেলেও মাথাটা ঠান্ডা রেখে চলতে পার। শহরে যেমন মানুষ তেমন গাড়ি। উহ্

ও কথা ভাবতে ভয় হয়, গাড়ির শব্দে মাথাটা থাকে সারাক্ষণ গরম। এই যে, দেখ না এখানে ক্ষুধা নিয়ে বসে আছি তাও কত ভালো লাগছে। নির্মল হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক করেছি আমি আর কোনোদিন শহরে ফিরে যাব না। তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লেগেছে। যাই একটু নাস্তা করে আবার আরো দূরের পথে রওনা দেব, আরো নির্জন জায়গায় শুধু একা থাকতে চাই। এই বলে কাক শালিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সারাদিন উড়তে উড়তে দূরে একটা বাড়ির কাছে ঝোপঝাড় ধরনের একটি জঙ্গলের কাছে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত কাটানোর জন্য একটা অচেনা গাছের ডালে বসল গিয়ে কাকটি।

এতটুকু ছোটো জঙ্গলে কতরকম গাছ আছে যা সে জীবনেও দেখেনি। একটু দূরে ডুমুরের গাছ থেকে কিছু ডুমুর গোটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কাক। ক্লান্ত শরীরে সারারাত আর কিছুই বলতে পারল না।

খুব ভোরে পাখিদের কিচিরমিচিরে ঘুম ভেঙে গেল কাকের। ঠোঁট দুটো উঁচু করে হা করে হাই ছাড়ল সে। এরই মধ্যে বনের অনেকেই বেরিয়ে গিয়েছে খাবারের খোঁজে।

এদিকে বনের বিভিন্ন পাখি এসে তাকে নতুন অতিথি ভেবে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগল। সে এখানে কেন এসেছে ? কতদিন থাকবে, এখানকার খবর পেলে কী করে ? কোথায় থাকবে ? কারো আত্মীয় কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে, নাহ এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। এখান থেকে খুব জলদি চলে যেতে হবে আরো নির্জন জায়গায়।

একটু পরেই সে রওনা দিলো অজানার উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে সে নদীনালা, হাওর, বাঁওড়, খালবিল অনেক গ্রাম পেরিয়ে দুপুর করে ফেলেছে। ভর দুপুরে সে বসল এক বিরাট বট গাছে। বট গাছটা ছিল ঠিক মাঠের মাঝখানে। চার দিকে ধূ-ধূ মাঠ এর মধ্যে গাছটা চারদিকে ডালপালা-শিকড় ছাড়িয়ে বিরাট আকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা আকাশের নীচে কি উদারতা বটগাছটার সবাই এসে ক্লান্ত হয়ে এর কাছে আশ্রয় নেয়। কৃষকরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলে মনটাকে একটু হালকা করতে পারে। বটগাছের এই উদারতায় শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায় কাকের। সে মনে মনে স্থির করল এখানে সে থেকে যাবে। আর কোথাও যাবে না সে। সে যেমন নিরবতা চেয়েছে তা সে পেয়েছে। এখানে কোনো গেঞ্জাম নেই।

একদিন এক কাকের সাথে পরিচয় হলো তার। সে তার কাছে তার একা থাকার কথা বলল। একা একা থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। কদিন পর সেই অতিথি কাক তার জন্যে এক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। তার দূর সম্পর্কের এক বোনের মেয়ে হয় নাকি সেই কনে কাক। সে অতিথি কাকের কথায় রাজি হয়ে গেল এবং বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলল। ইতিমধ্যে বটগাছে দিনের বেলা যে সব অতিথি পাখি আসে তাদের সবাইকে বিয়ের দাওয়াত করেছে সে। অনেককে বরযাত্রী হওয়ার জন্যও বলেছে। মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল তার। সবাই তাকে ও তার বৌকে ঘরে তুলে দিয়ে সন্ধ্যায় যে যার বাসায় চলে গেল।

মা-বাবা, ভাইবোনকে ছেড়ে এসে বউ কাকের মনটা খুব খারাপ লাগছিল। তাছাড়া ওখানে তারা অনেকে মিলে একসাথে থাকত। কত আনন্দেই না ছিল সে সেখানে। সে কথা মনে হয়ে খুব কান্না আসছিল তার। এভাবে দিন যেয়ে মাস যেতে লাগল।

এর মধ্যে চারটা ডিম পেড়েছে বউ কাকটা, বর কাক বউ কাক ডিমে তা দিচ্ছিল আর ভয়ে প্রহর গুনছিল। এখানে বেড়াতে কিংবা সময় কাটানোর জন্য ভালো কিন্তু ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করাটা খুব একটা নিরাপদ নয়। নিজেদের জন্য তো ভাবনা নয় ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন খুব আতঙ্ক। সেদিন এক প্যাঁচা পাখিকে দেখে বৌ কাকটার বুক ভয়ে দুরু দুরু করছিল। কি সাংঘাতিক ব্যাপার, নাহ, এখানে এত ছোটো বাচ্চা নিয়ে বসবাস করা সম্ভব নয়। কাক বাসায় আসলে আজই বলতে হবে দূরে যেখানে অনেকেই বসবাস করে সেখানে বেশি গাছ দেখে বাসা নিতে। আপাতত ছেলে-মেয়েরা উড়তে না শেখা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। কিছুদিন পর চারটা সুন্দর কাকের বাচ্চা বের হলো। তাদের লালনপালন করতে বাবা মার চোখে

ঘুম নেই। তাদের এখন একটাই চিন্তা কখন এরা বড়ো হবে। সে জন্য তারা বাচ্চাদের বাড়তি যত্ন নিতে লাগল।

বাবা কাকটা বুঝে গেল এত একা একা থাকা যায় না। সেদিন প্যাঁচা যেভাবে বড়ো বড়ো গোল গোল লাল চোখ বের করে তার ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছিল তা মোটেও ভালো ঠেকছিল না। সুযোগ পেলেই কখন তেড়ে এসে ঘাড় মটকে দেয় তার বিশ্বাস নেই।

এখানে তাকে সাহায্য করারও কেউ নেই যে ক'ঘর পাখি এখানে বাস করে তারা কেউই সাহসী নয়। তারা প্যাঁচার ভয়ে কিছুই বলবে না। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আসলে এখানে কোনো সমাজ নেই, বিচার নেই, আচার নেই।

এ সময় বাবা কাকটার ছোটোবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাদের বাসার কাছে একটা দুষ্টু ছেলে একটি কাকের বাসায় ঢিল ছুঁড়েছিল। সেকি এক তাণ্ডব কাণ্ড। কোত্থেকে হাজার কাক কা কা করে এসে এর প্রতিবাদ করল। সমস্ত মহল্লা একদম মাথায় তুলেছি। মানুষরা পর্যন্ত ভয়ে ছাদে উঠতে পারেনি। আজ এখানে বিপদ আপদে কাউকে পাওয়া যায় না।

আসলে সবাই মিলেমিশে বসবাস করার মজাটাই আলাদা। একজনের সুখে-দুঃখে আর একজন এগিয়ে আসে। যে-কোনো কাজ একসাথে মিলে করা যায়। নাহ, ছেলে-মেয়েরা একটু উড়তে শিখলে শহরে নয় একটু বেশি গাছপালা ওয়ালা বনে যেখানে অনেক পাখি একসাথে বাস করে সেখানে চলে যাব। শুধু মানুষ হবে কেন সব প্রাণীই সমাজবদ্ধ জীব। কাক ভাবল একা বনবাসে নয়, সবাই মিলেই বনে বাস করব। ■

নিবন্ধ

ভয়ংকর স্ফিংস

মমতাজ খান

ছোট্ট বন্ধুরা, আজ এমন এক দানবের গল্প তোমাদের শুনাব যার নাম শুনলে বড়োরাও আঁতকে ওঠে। সেই দানবের নাম হচ্ছে স্ফিংস। তার মাথাটা মানুষের মতো আর শরীর সিংহের মতো। তবে ঐ দানবের চেহারার তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমটির নাম অ্যান্ড্রাস্ফিংস যার মাথা মানুষের মতো। মেয়েদের মাথা এবং চেহারার মতো আর দেহ সিংহের মতো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্রাবোস্ফিংস যার মাথা ভেড়ার মতো এবং শরীর সিংহের মতো। তিন নম্বরটি হচ্ছে শরীর সিংহের মতো আর মাথা বাজ পাখির মতো, এর নাম হচ্ছে হেইরোকোস্ফিংস।

অনেকের ধারণা স্ফিংসের চেহারা রাজা কারাহ খাকরা অথবা তার ছেলের চেহারার আদলে গড়া। গ্রিক পুরাণে আছে স্ফিংস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের থিবস নগরীর রাজা স্ফিংস বা রাজা কারাহ খাকরা তার রাজবংশের চতুর্থ রাজা ছিলেন। অবশ্য স্ফিংসের পরিচয় নানা জায়গায় নানান ভাবে এসেছে। একজন গ্রিক কবি নাম হেমিউড তিনি লিখেছেন এই স্ফিংস হলো ইচিদনা এবং অফ্রসের মেয়ে। অবশ্য ঐ কবিও তাকে দানবী বলেই উল্লেখ করেছেন। থিবস নগরীতে যখনই কোনো বিদেশি প্রবেশ করত স্ফিংস তাকে জটিল ধাঁধার জালে আটকাত। ঐসব জটিল ধাঁধার উত্তর দিতে না পারলে স্ফিংস তাদের মেরে খেয়ে ফেলত। এভাবে সে অনেক মানুষ মেরেছে এবং খেয়েছে। গ্রিক বীর ইডিপাস জানতে পারেন এসব ঘটনা। ইডিপাস রওয়ানা দেন থিবস নগরীর উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছুলে রাজা ফারাহ খাফরা বা স্ফিংস ইডিপাসকে তলব করেন রাজদরবারে।

ইডিপাস রাজদরবারে উপস্থিত হলে স্ফিংস তাকে প্রশ্ন করেন– হে যুবক, বলো কী উদ্দেশ্যে তুমি আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছ?

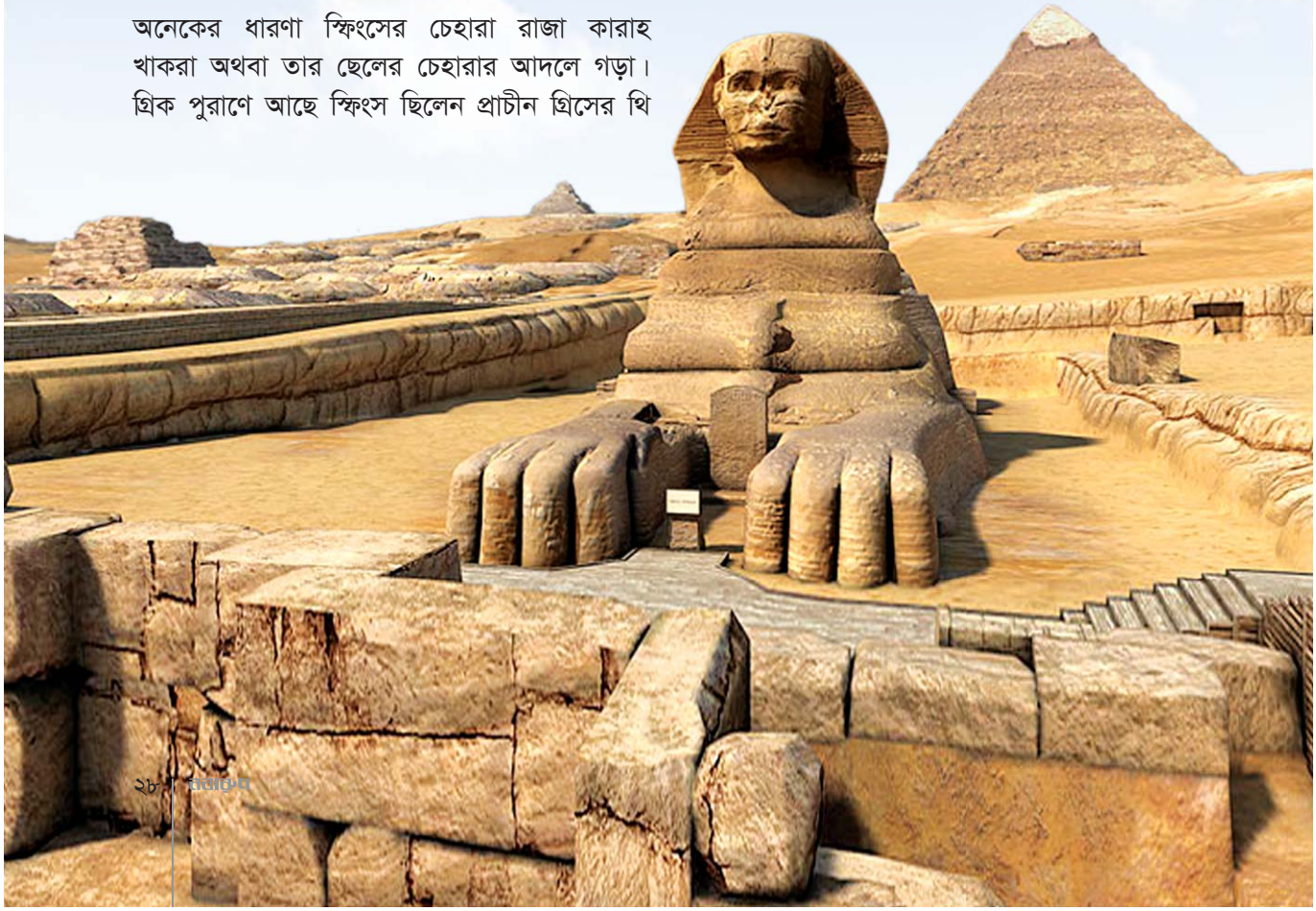

আফিয়া মাহমুদা লামিশা, ৩য় শ্রেণি, রাবেয়া মোশাররফ ক্যাডেট একাডেমি, গোপালগঞ্জ

ইডিপাস বলেন- কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এমনি ঘুরতে ঘুরতে আপনার রাজ্যে চলে এসেছি। যুবক তুমি কি জানো আমার রাজ্যে প্রবেশ করলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়? হ্যাঁ জানি। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে মেরে ফেলা হয় এটাও নিশ্চয়ই জানো? ইডিপাস নির্ভীক গলায় বললেন জানি। বেশ তাহলে প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হও। ইডিপাস বললেন আমি প্রস্তুত। স্ফিংস বলল, তাহলে প্রশ্ন করছি। বলো দেখি কোন সে জীব সকালে চার পায়ে হাঁটে আর দুপুরে দুপায়ে এবং সন্ধ্যায় চলে তিন পায়ে? ইডিপাস বললেন, সেই জীবের নাম হচ্ছে মানুষ। স্ফিংস চমকে উঠল এবং কাঁপা গলায় বলল, মানুষ? হ্যাঁ। ব্যাখ্যা করো।

ইডিপাস বললেন- একজন মানুষ শিশুকালে দুই হাত এবং দুই পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে একেই বলে চার পায়ে চলা। বড়ো হয়ে অর্থাৎ হাঁটা শেখার পর মাঝবয়স পর্যন্ত দুপায়ে হাঁটে। তারপর আসে মানুষের বৃদ্ধকাল যখন মানুষের চলার শক্তি কমে যায় তখন হাতে নেয় লাঠি। দুই পা এবং লাটির সাহায্যে ভর দিয়ে চলে একেই বলে তিন পায়ে চলা। স্ফিংস ভয়ংকর গর্জন করে বিকৃত গলায় বলল, তুমি কি উত্তরটা আগে থেকেই জানতে?

ইডিপাস তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন। এটা আবার আগে থেকে জানতে হয় নাকি। প্রশ্নটা তো খুব সাধারণ। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেই বলতে পারবে।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্ফিংস ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক উঁচু থেকে কঠিন পাথরে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কেউ বলে স্ফিংস নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলে। এভাবেই ধ্বংস হয় স্ফিংস নামক বিভীষিকাময় এক দানবের।

কিন্তু মিশরে গ্রেট স্ফিংস নামে স্ফিংসের পিরামিড আজও বিখ্যাত। এটা করা হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম স্ফিংস ভাস্কর্য মিশরের নীলনদের তীরে গীজা মালভূমিতে। এখনো আছে স্ফিংস, সত্য নাকি কল্পনা তা নিয়ে অবশ্য মানুষের মনে সন্দেহ এবং মতভেদ রয়েছে। ■

গল্প

অন্তু ও নীল মানুষ

সৈয়দা নাজমুন নাহার

অন্তুর রেজাল্ট বেরিয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট কার্ড মাকে দেখায়নি। বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। দুপুরে খায়নি ভালো করে। মা দুপুরে ঘুমুতে যান। এই ফাঁকে ছাদের চিলেকোঠায় চলে এসেছে অন্তু। অন্তু সব বিষয়ে ভালোভাবে পাস করলেও অঙ্কে পাস করতে পারেনি। বাবা আসবেন বৃহস্পতিবার। কী যে হবে! মেরে তক্তা বানিয়ে দেবেন। আর বড়দা কি ছেড়ে দেবে? সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ধরবে তাকে। ভাবতে ভাবতে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। চিলেকোঠা ছেড়ে ছাদের রেলিং-এর কাছে চলে আসে অন্তু। ও দেখতে পায় মাঠে রাশেদ, বাবু, মন্টি ওরা খেলছে। ওদের যে কী আনন্দ! ওরা সব পাস করে গেছে।

রেজাল্টের দিন বজলুর রহমান স্যার সবশেষে অন্তুকে ডাকেন।

এই গাধা তুই যে গাধাই রয়ে গেলি, তোকে অঙ্কটা শেখাতেই পারলাম না। আসলে অঙ্কই তোর আতঙ্ক।

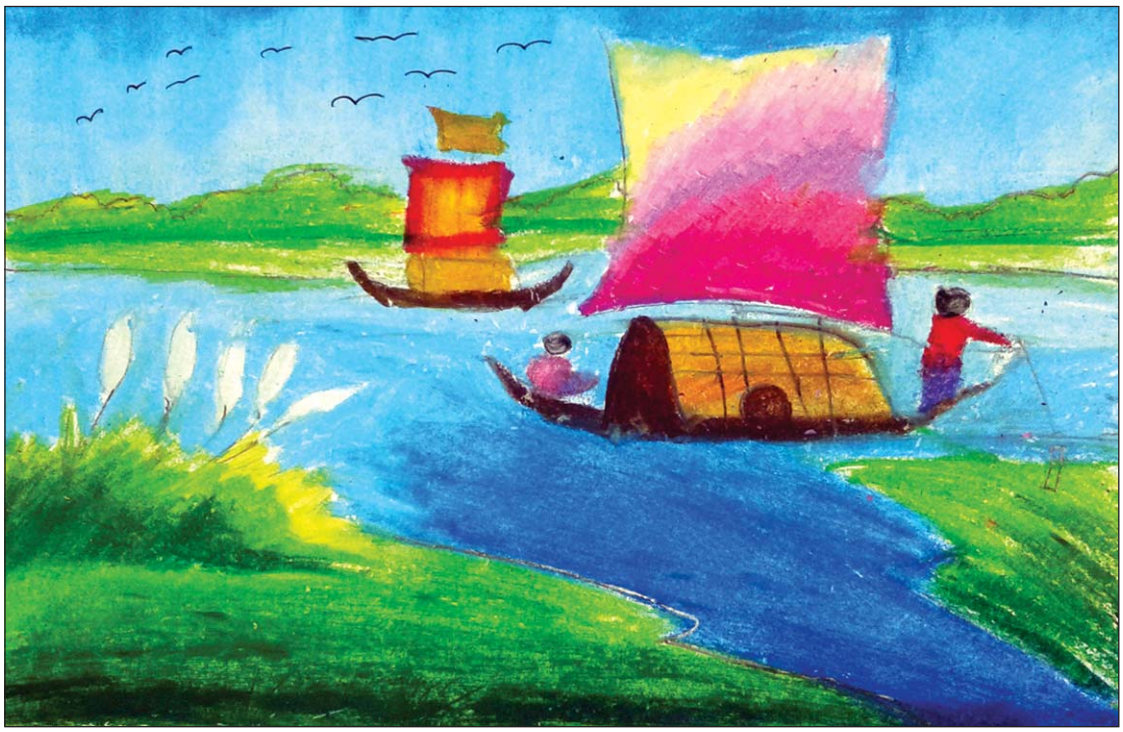

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, ২য় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন স্কুল, বনশ্রী, ঢাকা

অন্ধকার নেমে আসছে। আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়েছে। এই সময়টায় নাকি আল্লাহর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। অন্তু চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছে। চোখ খুলতে পারছে না। যখন চোখ খুলল দেখল কোথায় ছাদ! নিজেকে আবিষ্কার করল যন্ত্রপাতিতে ভরা কোনো ল্যাবরেটরির ওটিতে শোয়া, চারপাশে নীল মানুষ হাঁটছে। কোনো কথা বলছে না ওরা। ওর মাথায় বৈদ্যুতিক নানারকমের তার লাগানো। ওর মাথা স্ক্যান করা হচ্ছে কিন্তু ও বুঝতে পারছে না। শুধু একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যায় ও। ঘুম ভাঙলে ওরা নরম হাতে মাথায় হাত বুলায়। স্পষ্ট বাংলায় বলে উঠে, কিছু খাও বলে দুধ, সেদ্ধ ডিম, ফল এসব খেতে দেয়। অন্তু বিনা দ্বিধায় খায়।

ফল কাটতে গিয়ে পাশে থাকা মেয়েটির হাত কেটে যায়। ওর হাত থেকে এক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে অন্তুর শার্টে। অন্তু অবাক হয়ে দেখে রক্তের রং সবুজ।

মেয়েটি বলে, ওঠো আমরা যাচ্ছি ভিন্ন গ্রহে। পৃথিবীর ওপর দিয়েই যেতে হয়। তুমি ছাদে মন খারাপ করে দাঁড়িয়েছিলে দেখে তোমাকে তুলে আনি। যে থেরাপি তোমাকে দেওয়া হয়েছে তাতে তুমি শুধু অঙ্ক নয় অনেক বড়ো বৈজ্ঞানিক হবে একদিন। আমাদেরকেও আবিষ্কার করবে তুমি। এবার চলো তোমাকে রেখে আসি। চোখ বন্ধ করো।

মুহূর্তেই অন্তু আবার নিজেকে ছাদের চিলেকোঠায় আবিষ্কার করে। ঐ তো মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। 'অঙ্কে ফেল করে চিলেকোঠায় লুকিয়েছিস। আয় নেমে আয়।'

গায়ে হাত দিয়ে মা অবাক! জ্বর বাধিয়েছিস, নেমে আয় জলদি।' চিলেকোঠা থেকে নামিয়ে মা ওকে লেপের তলায় ঢুকিয়ে দেন। সে রাতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় অন্তু। আর সকালে একেবারে অন্য মানুষ যেন। কিছুই হয়নি ওর। অঙ্ক কষতে বসে, কী আশ্চর্য! সব অঙ্ক পানির মতো হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী পরীক্ষায় অন্তু সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করে। আর একগাল হেসে বজলুর রহমান স্যার বলেন, আরে আমার গাধাটা দেখি মানুষ হয়ে গেছে। কী আনন্দ, অন্তু জানে নীল মানুষের থেরাপির কথা। কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। ■

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে

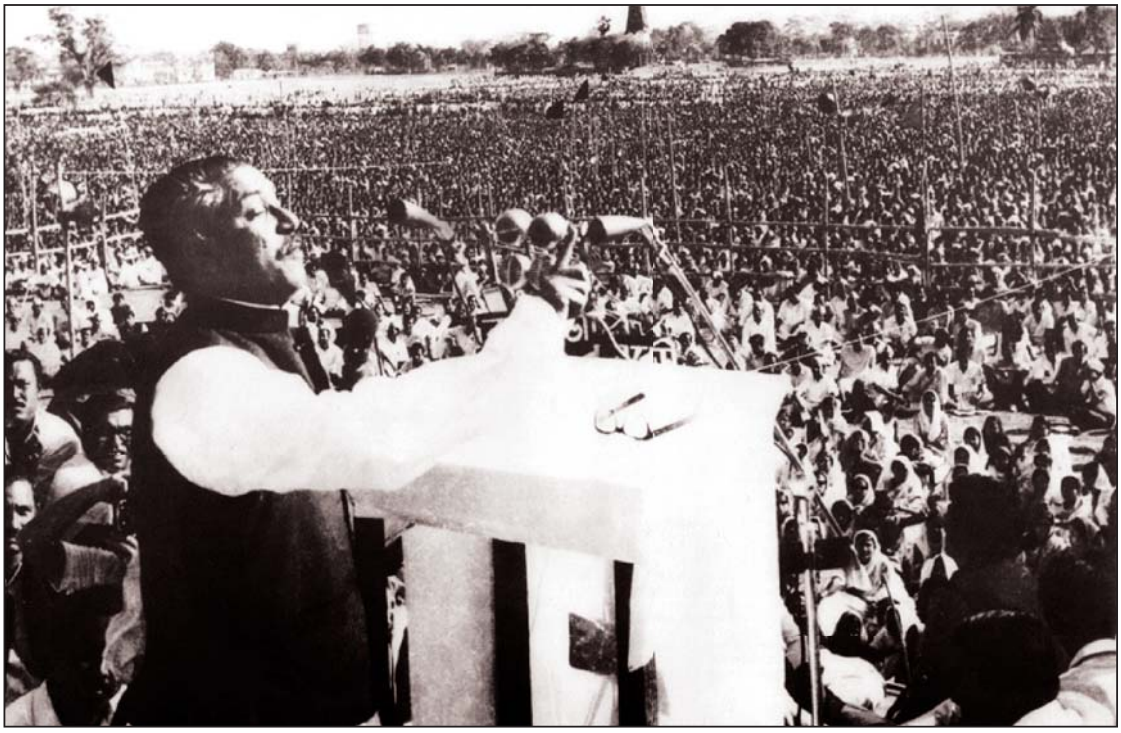

শহিদ আবদুস সাত্তার

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎকালীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত কয়লার দিয়ার গ্রামের কায়সার আলী মোল্লা ও আজিজুন্নেসার সন্তান মো. আবদুস সাত্তারের বয়স ছিল ১৭ বছর। ১৯৭১ সালে তিনি দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে আবদুস সাত্তার দিনাজপুর থেকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশনা পান। অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিবগঞ্জের কলাবাড়ি ও এর আশপাশের যুবসমাজও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা একত্রে কয়লার দিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে লাঠি দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ২৫শে মার্চের গণহত্যা শুরু হওয়ার পর তাঁরা খবর পান যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের গ্রামের নিরীহ মানুষদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা আরও জানতে পারেন যে, ২৬শে মার্চ থেকেই রাজশাহী শহরে অবস্থিত ইপিআর-এর সেক্টর সদর দপ্তর ও ২ নম্বর উইং, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত ৬ নম্বর উইং ও নওগাঁর ৭ নম্বর উইং-এর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করেছেন। ২৬শে মার্চ রাজশাহী রেঞ্জের বাঙালি পুলিশ সদস্যরা ডিআইজি মামুন মাহমুদ ও পুলিশ সুপার শাহ আবদুল মজিদের নেতৃত্বে নিজেদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। এদিকে রাজশাহী শহরের অদূরে উপ-শহরে

অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টও এলাকায় এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

৭ই এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহী শহর নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু ১০-১৪ই এপ্রিলের মধ্যে ঢাকা থেকে আগত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রাজশাহীতে অবস্থানরত ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগদান করলে মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহী শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইতোমধ্যে ২৬শে মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৬ নম্বর উইং-এর অন্তর্গত রহনপুর ক্যাম্পে অবস্থানরত ইপিআর-এর পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে বাঙালি সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ইপিআর-এর একজন পাকিস্তানি অফিসার ও ৩০জন সৈন্য হতাহত হয়। বাকি পাকিস্তানি সৈন্যরা রহনপুর উইং সদর দপ্তর ত্যাগ করে বাজারে গিয়ে কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। এই গণহত্যার নেতৃত্ব দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুবেদার মেজর দাদু খান ও হাবিলদার মেজর গুলজার খান।

২৭শে মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইপিআর-এর বাঙালি সদস্য ও এলাকাবাসী একত্র হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করেন। ৪ঠা এপ্রিল রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়ক সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করা হয়। ১৭ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা চাঁপাই নবাবগঞ্জ আক্রমণ করলেও মুক্তিযোদ্ধারা ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত চাঁপাই নবাবগঞ্জ মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। ২৩শে এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা বিভিন্ন এলাকায় তাদের অপারেশন কার্যক্রম শুরু করে।

২৪শে এপ্রিল কলাবাড়ি গ্রামের যুবকরা গোপনে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২৫শে এপ্রিল ভোররাতে কয়লার দিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একত্রে মিলিত হয়ে সেখান থেকে তাঁরা সীমান্তের দিকে রওনা হবেন। তাদের মা-বাবা তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যেতে দিতে রাজি হবেন না এই আশঙ্কায় গোপনে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমতো কিছু টাকা নিয়ে আসবেন বলে স্থির করেন।

আবদুস সাত্তার ছিলেন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। তিনি ছাত্র ছিলেন বলে নিজের কাছে কোনো টাকাপয়সা ছিল না, কিন্তু ভারতে যেতে তো টাকাও লাগবে! তাই এক রাতে তিনি অনেক ভেবেচিন্তে বাড়ির সবাই রাতের খাবার শেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার পর গোপনে তাঁর বাবার ঘরে প্রবেশ করে বাবার টাকার বটুয়াটি খুলেন। এমন কাজ করতে খুব মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল, কারণ জীবনে মা-বাবার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করেননি। কিন্তু আজ বাবার অনুমতি ব্যতীত গোপনে টাকা নেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না, কেননা টাকা চাইলে তার বাবা হয়ত তাঁকে যেতে বাধা দিতে পারেন। কিন্তু বাবার বটুয়াতে কোনো টাকা ছিল না, আবার টাকা ছাড়া ভারতে যাওয়াও সম্ভব নয়। সাত্তারের মা তখন পর্যন্ত রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। তাই গভীর রাত পর্যন্ত সাত্তার ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকেন। রান্নাঘরের সব কাজ সেরে মা বের হয়ে গেলে কিছুক্ষণ পর আবদুস সাত্তার সন্তর্পণে রান্নাঘরে প্রবেশ করে চালের মটকা থেকে চাল বের করে গামছাতে বাঁধলেন। মটকার ভিতরে সম্ভবত দুই সের চালই ছিল!

চাল নিয়ে গভীর রাতে আবদুস সাত্তার কয়লার দিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে পৌঁছান। সেখানে আরও ১২জন কিশোর ও যুবককে দেখতে পান তিনি। সকলে মিলে সীমান্তের দিকে রওনা হন। সীমান্তে পৌঁছার পর আবদুস সাত্তার দুই সের চাল বিক্রি করে কিছু টাকা পান। অনুমতি ছাড়া চাল আনার কারণে বিবেকের দংশনে তিনি দংশিত হতে থাকেন।

সেসময় মোট ১৩জন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মানকাচর থানার পশ্চিমে অবস্থিত এনায়েতপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে ভারতীয় বিএসএফ-এর সদস্যরা তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিলিগুড়ির পানিঘাটা মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যান। সেখানে এক মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আবদুস সাত্তারকে মহোদিপুর সাব-সেক্টরে প্রেরণ করা হয়। এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক

ছিলেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। তিনি ছিলেন সাহসী ও অভিজ্ঞ গেরিলা অধিনায়ক। উদ্যমী যুবক আবদুস সাত্তার ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে কানসাটের যুদ্ধ, আরগরার হাটের যুদ্ধ, শাহপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি যুদ্ধেই আবদুস সাত্তার সাহসিকতার পরিচয় দেন। মায়ের অনুমতি ছাড়া রান্নাঘর থেকে দুই সের চাল নিয়ে আসার কথা প্রায়ই তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদেরকে বলতেন এবং এজন্য এই কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন।

২০শে নভেম্বর দিবাগত রাতে (সেদিন ছিল ইদুলফিতর) মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে কানসাট আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় আবদুস সাত্তার গুলি করতে করতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর একটি গুলি আবদুস সাত্তারের গলায় বিদ্ধ হয়। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে তিনি ইশারায় ও যতদূর সম্ভব কথার মাধ্যমে তাঁর সহযোদ্ধাদেরকে বলেন যে, দুই সের চাল না বলে আনার জন্য মায়ের কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার কথা যেন তাঁরা পৌঁছে দেন। মৃত্যুর সময়েও তাঁর মনে অনুশোচনা ছিল কারণ তিনি তাঁর মায়ের অনুমতি ছাড়া গোপনে দুই সের চাল নিয়ে এসেছিলেন। এর ফলে তাঁর মায়ের মনে কষ্ট দিয়েছিলেন।

সহযোদ্ধারা শহিদ আবদুস সাত্তারের দেহ বালিয়াদিঘির পাড়ে নিয়ে আসেন। সেখানে তাকে সসম্মানে দাফন করা হয়। সেখানে একটি গণকবরও আছে, যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যার শিকার অনেক মানুষকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেই স্থানে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে আর নামকরণ করা হয়েছে শহিদ স্মারকস্তম্ভ। স্মারকস্তম্ভের শহিদদের তালিকার ৪ নম্বরে শহিদ আবদুস সাত্তারের নাম লেখা আছে। গ্রামবাসী আলহাজ কালু শেখ, আলহাজ জমশেদ আলী ও জমির মুনশি শহিদ আবদুস সাত্তারের কবর খনন ও দাফনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন। ■

[বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত]

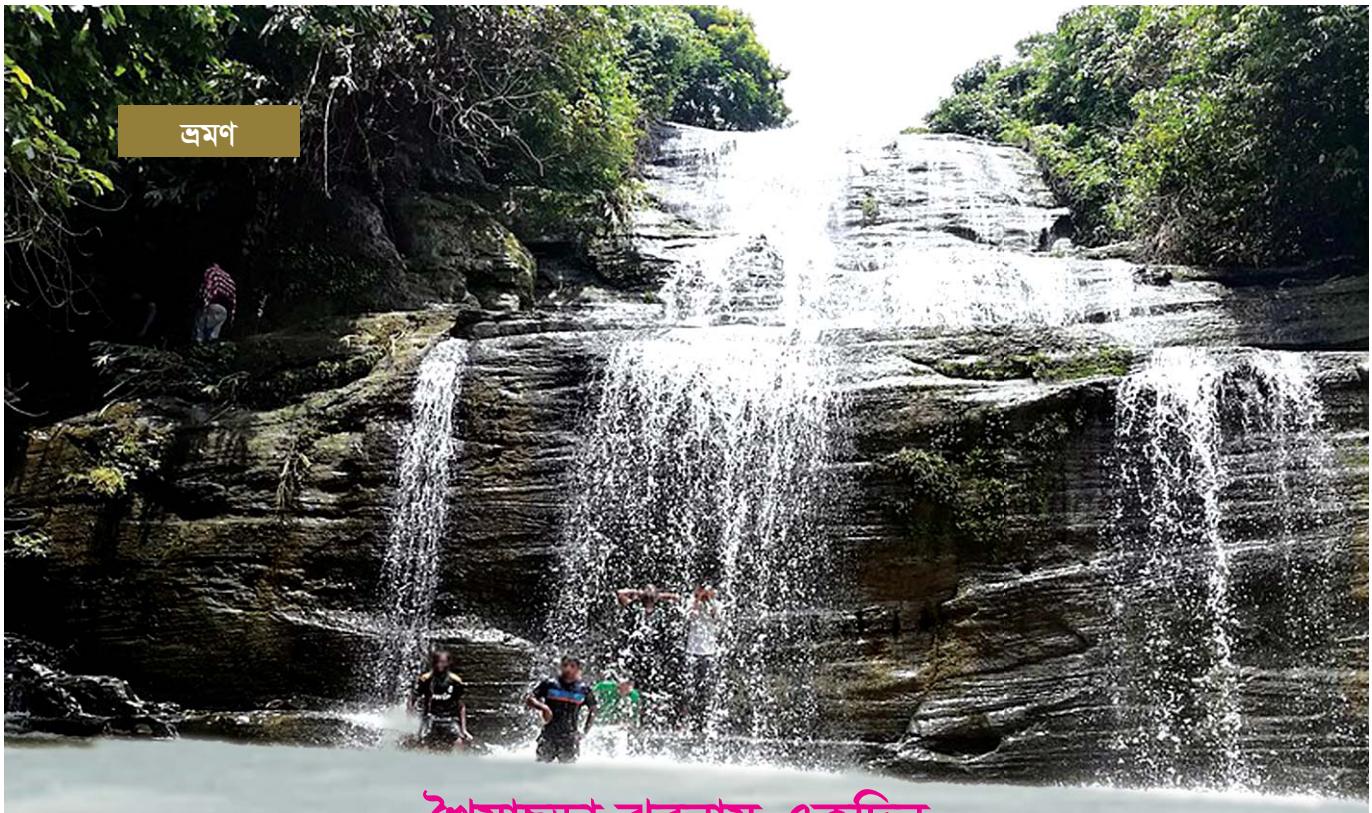

খৈয়াছড়া ঝরনায় একদিন

রুমান হাফিজ

আড্ডা দিচ্ছিলাম ভার্সিটির বুদ্ধিজীবী চত্বরে।

মাহবুব এসে যোগ দিলো। কথা চলছিল নানা বিষয়ে। হঠাৎ মাসুম ভাই সবাইকে থামিয়ে দিলো।

আচ্ছা, সামনের দু-দিন তো অফ ডে। কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যায় কি না!

সাথে সাথে মাহবুব বসা থেকে উঠে পড়ল। ও সব কিছুতেই একটু বেশি আবেগ প্রকাশ করে!

হুম, যাওয়া যায়। সাথে পলিটিক্যাল সাইন্স বিভাগের নাইম ভাইও যোগ দিলেন। আমি আর না করি কেমনে! তিনজনের সাথে একাত্মতা পোষণ করলাম।

এখন কথা হচ্ছে, কাছাকাছি কোথায় যাওয়া যায়। সবাই ভাবল কিছুক্ষণ। কেউ কাছের আবার কেউ দূরের জায়গাগুলোর নাম বলতে লাগল একযোগে। এবার মাসুম ভাই বললেন,

আমরা তো খৈয়াছড়া ঝরনায় যেতে পারি। কাছাকাছি আছে। আবার একটু হলেও পাহাড় বেয়ে ঝরনা দেখলে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া যাবে।

এক্ষেত্রে কারো দ্বিমত না হওয়াতে নির্ধারিত সময়ে আমরা রওয়ানা করি চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত খৈয়াছড়া ঝরনার উদ্দেশ্যে।

আমাদের সাথে আরো যোগ দিলেন, শরীফ ও কামরুল ভাই।

পৌঁছাতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগেছে। তবে মেইন রোড থেকে ঝরনায় যেতে আবার সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় চড়তে হয়।

তারপরের সবটুকু পথই হাঁটার। উঁচুনিচু পথ পাড়ি দিতে হয়। জায়গাটা বেশ নীরব। তার উপরে গহিন অরণ্য

বেষ্টিত। ভয় একটু হলেও কাজ করছিল। গরমে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

সাথে রাখা পানি একটু পর পর সবাই গিলতে লাগলাম। মাসুম ভাই তার বেসুরা গলায় গানের কিছু লাইন উচ্চারণ করার চেষ্টা যে করেননি তা নয়। তবে পেরে উঠতে সক্ষম হলেন না। কারণ, উনার কণ্ঠ ভেসে উঠার আগেই নাইম ভাই সেরকম বিরক্তিভাব নিয়ে থামিয়ে দিতে সময়ক্ষেপণ করেননি। বিষয়টা মজার ছিল!

এভাবে কিছুক্ষণ পর পৌঁছালাম ঝরনায়। উপর থেকে নেমে আসা শীতল পানির ছিটা গায়ে লাগতেই সব ক্লান্তি যেন মুহূর্তেই হারিয়ে গেল!

কাপড়চোপড় পালটে নিয়ে ঝরনার স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। মূল আকর্ষণ তো পাহাড়ের উপরেই। সুতরাং সবাই সেখানে যাব। এজন্য পাড়ি দিতে হবে উঁচু এবং ঢালু পাহাড়। নিচ থেকে দেখেই তো আমার স্বাদ চুপসে গেল!

এত্ত উঁচু পাহাড়, তাও উপরে উঠতে হবে দড়ি ধরে! সাহস সঞ্চার করে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাকে উঠতেই হবে। উপরের একটা ধাপে থামলাম। কাপড় পরিবর্তন করে নিলাম সবাই। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ঝরনার শীতল পানিতে। উপর্যুপরি ডুব দিলাম এদিক ওদিক। দুর্গম উঁচু পাহাড় বেয়ে উঠার সব কষ্ট যেন শীতল পানির সাথে ভেসে গেছে। একজন আরেকজনের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে গিয়ে মনে হচ্ছিল সেই ছোট্ট বেলার দুরন্ত শৈশবে চলে গেছি। অবস্থা এমন যে, দুরন্তপনায় কারো থেকে যেন কেউ কম না! কম সময়ের এই ভ্রমণটা বেশ ভালোই উপভোগ্য ছিল।

বাংলাদেশের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক ঝরনাগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে খৈয়াছড়া ঝরনা অন্যতম একটি। চট্টগ্রাম উত্তর বনবিভাগের বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যানের ভেতরে অনিন্দ্য সুন্দর এই ঝরনার অবস্থান। একে একে নয়টি বড়ো ধাপে এই ঝরনা থেকে অনবরত পানি ঝরছে।

কম সময়ে কাছের কোনো জায়গায় ঘুরে আসতে পেরে বেশ ভালোই লাগল। এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ মাসুম আহমদ ইকবাল ভাইকে! ■

তাহমিনা রহমান নিশাত, ৩য় শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

বিহঙ্গ সখা বৃক্ষ

মানিক বৈরাগী

কয়েক বছর আগেও এখানে গহিন অরণ্য ছিল। বহু প্রজাতির বৃক্ষ শোভা পেত। নেটং থেকে রুমকা, পালং, রেজু, নাফ, হোয়াইকং থেকে চেপট খালি, মনখালি পর্যন্ত সারি সারি বৃক্ষের পাহাড়ে সূর্যের দেখা মিলত খুব দেরিতে।

এইসব পাহাড়ে বৃক্ষের পাশাপাশি বন্য ফলের গাছ, লতা, গুল্ম ও পাহাড়ি শাকপাতা রয়েছে প্রচুর।

এই বিশাল অরণ্যের কারণে এখানে পাখি মেলা হতো। কত রঙের কত রকমের পাখিরা যে আসত, বাসা বাঁধত। তারমধ্যে কিছু স্থায়ী, কিছু অতিথি পাখি। এ এলাকাটি ছিল পাখির অভয়ারণ্য।

কত ধরনের বন্যপ্রাণী ছিল তা শুমারি করা যেত না।

আজ এই চিরহরিৎ বনাঞ্চল নিমিষেই কোথায় হারিয়ে গেছে।

অবশিষ্ট যা আছে এর মধ্যে গর্জন, সেগুন, মেহগনি, চাপালিশ, হরিতকি। তাও হাতে-গোনা কয়েকটি। এই অবস্থায় বৃক্ষরা চিন্তামগ্ন।

সেগুন ও গাজন পাশাপাশি লাগুয়া থাকে। এরা পরস্পর প্রতিবেশি। মুখোমুখি তাদের বাস।

চাতকির সাথে চাপার বিশেষ ভাব। চাতকি দিনে কয়েক বার চারদিক ঘুরে এসে চাপার ডালে বসে। দুনিয়ার খবরাখবর চাপাকে বলে। কারণ চাপা উড়তে ও হাঁটতে পারে না। কিন্তু তার মন উড়ে ঘুরে। বাতাস এলে দোলা দেয়।

কিন্তু কদিন ধরে চাতকি খুব ছুটোছুটি করে। হাপিত্যেশ করে। পাঁচ-দশ মিনিট স্থির হয়ে চাপার সাথে মন খুলে কথা বলে না। আসলে ও অনেকটা গম্ভীর হয়ে থাকে। গান গায় না। পাখা নেড়ে হাসে না। চাতকির এই অবস্থা দেখে চাপা জানতে চায়।

চাপা: চাতকি তুমি উড়াউড়ি করো কেন? কই যাও? কী হইছে তোমার। জানো কতদিন হয় তুমি আমাকে গান শুনাওনি। আমি কলি ফুটাতে পারছি না।

তুমি গেলে যে আমি একা হয়ে যাই। এক সময় ডাহুক আসত, সারস আসত। এরাও এখন আসে না। আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

জানো চাতকি তুমি আসলে, আমার ডালে বসে পাখা নাচালে, আমার কলিতে বসে মধু খেলে মন মেজাজ ভালো থাকে।

চাপার এই খুশির আনন্দে গর্জনের খুব হিংসা হতো।

কদিন ধরে গাজনের ডালে যে সারস ও ডাহুক আসত তারা এখন আর আসছে না। তাই গাজনেরও মন খারাপ। এক সময় গাজনের কাছে কৈতরি আসত। বাকবাকুম করে গান শুনাতো। টিয়া সুন্দরিরও দেখা নেই।

গাজন: ও চাপা ভাই, তোমাকে কখন থেকে ডেকে যাচ্ছি শুনোনি মনে হয়।

চাপা: না শুনিনি। এতক্ষণ চাতকিকে তোমার কথা বলছিলাম। বলো কী বলতে চাও।

গাজন: তোমার চাতকিকে বলো আমার কৈতরিকে সে দেখেছে কি না? একটু খোঁজ নিতে বলো।

চাপা: আচ্ছা বলে দিচ্ছি।

চাপা: চাতকি আমার প্রতিবেশি, গাজনের বন্ধু। কৈতরি কদিন ধরে আসেনি। তুমি একটু আশপাশ ঘুরে খোঁজ নাও ভাই। এই বছর তার শাখায় কেউ আসেনি। দেখছ না সে কেমন চিন্তিত।

চাতকি: কৈতরি কী এখন আসে না চাপা? কদিন হয়। তা তো জানি না। আমি তোমার আশায় থাকি, তাই গাজনের খোঁজ নেওয়া হয়নি।

চাতকি-আচ্ছা আমি যাই। খোঁজ নিয়ে জানাবো। তোমাকে তো জানায়নি। ঐ নেটং, পালং-এর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এসেছে। এরা না কি রোয়াং।

আমাকে কাকলি বলেছে। কাকলিরা এখন খুব ব্যস্ত। তাদের খাবারের অভাব হচ্ছে না। ওরা সব সাবাড় করছে মানুষের উচ্ছিষ্ট। তবুও গন্ধে ওদিকে যাওয়া যায় না। রোয়াংরা রাক্ষসের মতো ক্ষুধার্থ। যা পাচ্ছে সব খাচ্ছে। অন্যের বাসা তছনছ করেছে। তোমাদের কাটছে। আচ্ছা তবুও আমি খোঁজ নিচ্ছি।

চাপা: ও ভাই গাজন, চিন্তা করো না। আমি চাতকিকে বলেছি। তোমার কৈতরি কোথায় আছে খোঁজ নেওয়ার জন্য।

গাজন: তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

চাতকি: চাপা ভালো থেকো। এখন আমি আসি।

চাপা: যাও। এসো কিন্তু তাড়াতাড়ি।

চাতকি কয়েক দিন ধরে কৈতরিদের চারদিকে খুঁজতে লাগল। সে মনখালি থেকে রুমখা, রুমখা থেকে

নেটং ঘুরে ঘুরে দেখেছে। কোথাও মুক্ত কৈতরিদের দেখা যায় কি না। কোথাও কোনো কৈতরির দল খুঁজে পায়নি। চাতকিও এবার চিন্তিত হলো।

চাতকি শাপলাপুরে এসে জেনেছে রোয়াংরা কৈতরিদের ধরে ধরে পুড়িয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলছে এবং কৈতরি ধরার জন্য জালের ফাঁদ বসিয়েছে। চাতকি আর দেরি না করে উড়াল দিল চাপার দিকে।

চাতকি: চাপা ও চাপা শুনছ। খবর পেলাম রোয়াংরা নাকি তাদের খাবার উপযুক্ত সব বিহঙ্গ ধরে ধরে খেয়ে ফেলছে। আর জালের ফাঁদ বসিয়েছে।

চাপা: চাতকি বন্ধু তুমি আমার। আমার কলির সব মধু তোমাকে খাওয়াই। তুমি আর ঐদিকে যেও না।

চাপা: ও গাজন। শুন দুঃখের কথা। ঐ দিকে নাকি রোয়াংরা এসেছে। ওরা নাকি বাস্তুচ্যুত। নির্যাতিত। ওরা না কি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ চিনে না। ওরা সব উজাড় করে দিচ্ছে আমাদের কেটে কেটে।

গাজন: খুব দুঃখের খবর।

চাপা: ওরা তোমার কৈতরিকে জাল দিয়ে ধরে খেয়ে ফেলেছে।

গাজন: ওহ এই দুঃখ কারে বুঝাই।

আমি তারে কতবার বলেছি। বেশি দূরে না যেতে।

আমার পরাগায়নেরও সময় হয়েছে। অথচ এবার সব মধু তাকে ও ডাহুকিকে দেবো বলেছিলাম। ডাহুকিও কতদিন হলো আসে না।

চাপা: আমি চাতকিকে বলে দিয়েছি, এই পাড়া থেকে দূরে কোথাও না যেতে।

গাজন: দেখো ভাই। আমার গায়ের সব চামড়া ফেটে যাচ্ছে। আমার কলিরা না ফুটেই ঝরে যাচ্ছে। এই বেদনা কারে বুঝাই। কে দিবে পরিত্রাণ।

জানো চাপা, আমার কাণ্ডের গোড়ালিতে যে নাগ-নাগিনরা আসত তারাও আসে না এখন। আমার ডান কাণ্ডের কোটরে যে ঝিঁঝিরা থাকত তারাও ঐ অশথের কাছে চলে গেছে। ডাকলেও আসে না। ওরাও কত সুন্দর করে আমাকে দিনে-রাতে গান শুনাত। তোমার

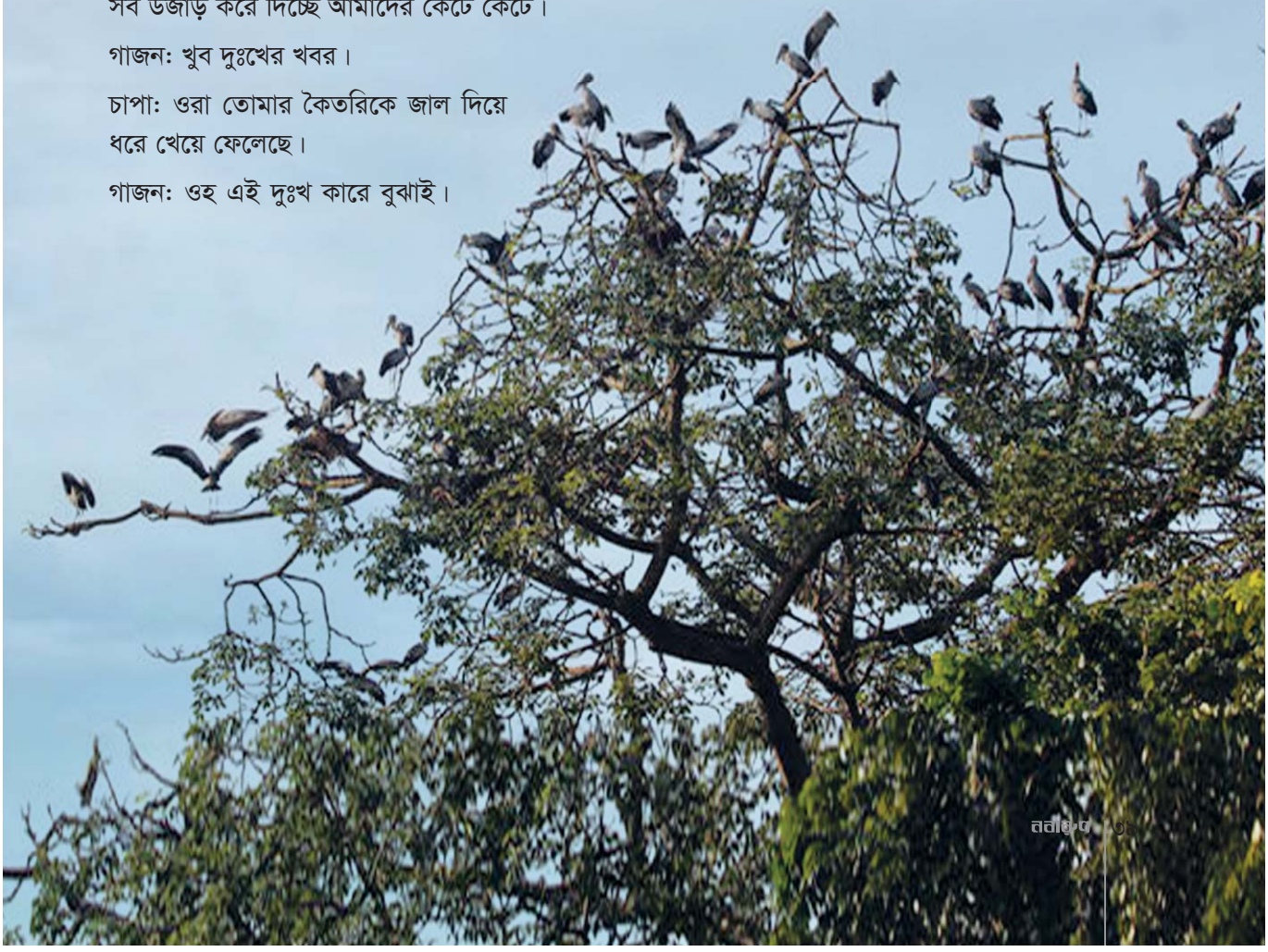

পাশে হিজলের ডালে যে জোনাকিরা ছিল তারাও আর নাই। কী জমানা আইলো রে ভাই। সব নিষ্ঠুর।

চাপ: কী করবা গাজন, ওরা না কি খুব বিপদে পড়ে এখানে এসেছে। উদ্বাস্তুদের যা অভ্যাস তাই করছে। আর তোমার কৈতরি যেমন সুন্দর, তেমন গান গায়। লাল পা দুটি দেখলেই মানুষের লোভ লাগে। তুমি যদি আগে তাকে বারণ করতে এমন দশা তোমার হতো না।

গাজন: আমি তাকে বারণ করেছিলাম, জানো তো কৈতরিরা খুব একরোখা।

এমন অবস্থা হলে ওরা আমাদের দিকেও আসবে। আমরা বাঁচব কীভাবে।

চাপা: চিন্তা করছি। খেয়াল করোনি তোমাদের ঐ দিকে অশ্বত্থের শাখায় শাখায় যেসব পাখিরা আসত। তারাও এখন আসে না।

এমন সময় চাতকি এসে হাজির।

চাতকি: শুনেছ চাপা, রোয়াংরা নাকি আবারো দলে দলে আসছে এ দিকে। আমার চাতকি দল জীবন বাঁচাতে নাইক্ষং-এর দিকে চলে যাচ্ছে। কখন আসি বলতে পারি না। যদি বেঁচে থাকি তোমার খবর নিব, তুমি ও তোমরা ভালো থেক।

এমন পরিস্থিতিতে গাজন আর চাপা গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঠিক এই সময়ে একটি ডানাওয়ালা ঘোড়ার মতো পাখি নিয়ে নামছে আকাশ থেকে। পাখি এসে বসল পাশের হরিতকির ডালে।

অশ্বত্থ, গাজন, চাপা সবাই প্রাণী পাখিটির দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকল হা করে।

অশ্বত্থ: তোমাকে আমরা চিনতে পারছি না। একটু তোমার পরিচয় দিবে কী?

বোররাক—আমার নাম বোররাক। আমি থাকি আকাশের অনেক উপরে। যার নাম আরাফ। আমার কর্তার নাম এলহাম। তিনি আমাকে তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন।

আমি প্রতি হাজার বছর পর পর আসি। বলো তোমাদের এমন দশা কেন? তোমরা কী চাও।

চাপা–গাজন-অশ্বত্থ —দেখুন এখানে পশুপাখি, লতাগুল্ম ও আমরা সবাই একদিন আগেও মিলেমিশে ছিলাম। রোয়াংরা এসে আমাদের এমন বিপদের মধ্যে ফেলেছে। তুমি সব দেখেছ নিশ্চয়ই। তুমি কি আমাদের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে?

আমরা প্রতিদিন বিপন্ন হতে চলেছি। সবাই কেমন যে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও আতঙ্কিত। আমরা পরিত্রাণ চাই।

বোররাক: আমি তোমাদের পরিত্রাণের জন্যই এসেছি। রোয়াংরাও তোমাদের মতো বিপদগ্রস্ত। তোমাদের যেমন প্রাণ আছে, প্রাণের প্রতি মায়া আছে। ঠিক তেমনি রোয়াংদেরও আছে। ওরা মানুষ। আর তোমরা প্রকৃতি।

তোমরা কিন্তু ঘাতক নও। তোমরা মারামারি, কাটাকাটি করো না। তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। তোমারা এই জায়গায় তাদের থেকে অধিক অধিক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমাদের উপর প্রকৃতির আশির্বাদ আছে।

আমি তোমাদের অরণ্য তোমাদের কাছেই ফিরিয়ে দিব। আর ঐ রোয়াংরা বিপদ না কাটানোর জন্য সন্ধীপে জেগে উঠা চরে চলে যাবে। প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন। একটু অপেক্ষা করো। এখানে আবার আবাবিল পাখি এসে বীজ ছড়াবে। নতুন বৃক্ষ হবে। তখন তোমাদের পরাগায়ণের জন্য সব পাখি ফিরে আসবে।

বোররাক: কী বলো তোমরা

গাজন, চাপা, অশ্বত্থ হরিতকি-আমরা সবাই আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বোররাক: ভালো থেকো। ■

জেনে নাও

চাপা-চাপালিশ বৃক্ষ
গাজন-গর্জন বৃক্ষ
চাতকি-চাতক পাখি
কৈতরি-কবুতর
কাকলি-কাক।
বোররাক-ইসলাম ধর্মীয় মিথ পাখি
আরাফ-ইসলাম ধর্মীয় ঊর্ধ্বাকাশের নাম।

অর্থি ও তার বন্ধুরা

হামিদুর রহমান

সোনা মণি অর্থি আমার
মধুর তোমার হাসি!
ছবি ছড়ায় এঁকে যাও
তোমার বিজয় বাঁশি।
এই আশিস করছি আজ
তোমার দাদু মণি,
সুন্দর হয়ে এই ধরাতে
গাও তার আগমনী।

আমার পাঁচ বছরের আদরের নাতনি অর্থি। তার অনেক বন্ধু। তারা হলো অপু, মরিয়ম, তাইয়েবা, মেহেদী, টুশি, রীমা, ইমু ফুপি ও শিমু ফুপি। এদের সাথে তার বড্ড ভালোবাসা। এদের দেখে তার খেলা জমে উঠে। মাঝে মাঝে ফোনে আলাপ হয়। অর্থি এদের খুব পছন্দ করে।

অর্থি ভালো গল্প বলতে জানে। টম-জেরির গল্প, মশা-ভাল্লুকের গল্প, পরির গল্প, রাক্ষসের গল্প, হাসির গল্প, রঙিলা চোরার গল্প, বুড়া-বুড়ির গল্প ইত্যাদি। হাসির গল্পের মধ্যে জোলার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা গল্প। অর্থি হাসির গল্প বলে শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলে, গল্প শুনে শ্রোতারা হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে ওঠে। এসব গল্প ছাড়াও

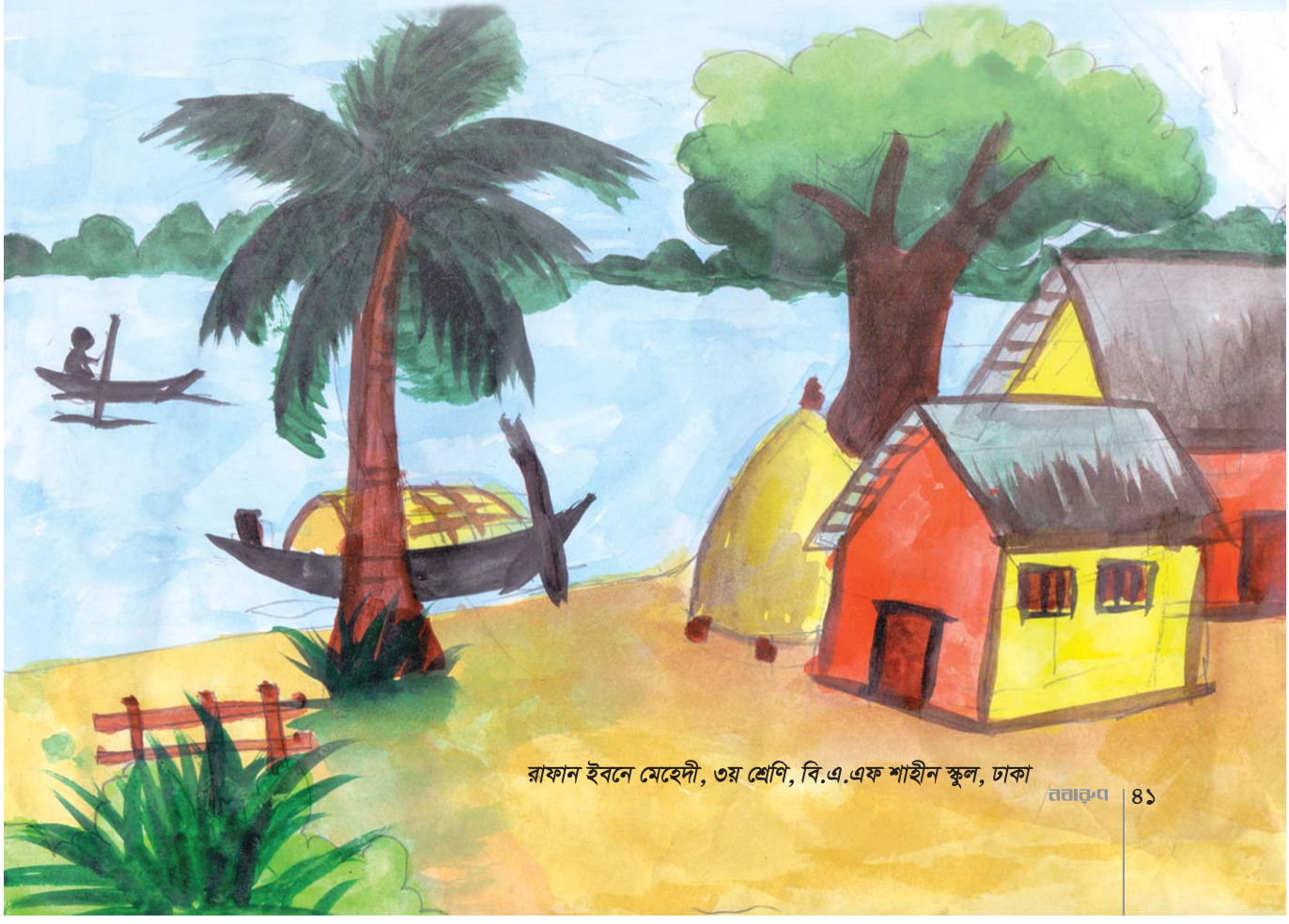

রাফান ইবনে মেহেদী, ৩য় শ্রেণি, বি.এ.এফ শাহীন স্কুল, ঢাকা

অর্থির আরো গল্প জানা আছে। অর্থির খুদে বন্ধুদের মধ্যে অপু তার ফুফাতো ভাই, মরিয়ম তার চাচাতো বোন, তাইয়েবা ফুফাতো বোন, মেহেদী তার প্রতিবেশী।

গল্প বলা ছাড়া অর্থি ছবি আঁকে, ছড়া লিখে, তার লেখা গল্পগুলো হলো– গোলাপজাদী ও তার বন্ধুরা, পুঁটির গল্প, গোলাপ ও হরিণ, পনি বন্ধু ইত্যাদি।

অর্থির অন্য বন্ধুদের মধ্যে হুলো, মিনি, পুষি, প্রজাপতি ও পরি। অর্থির দাদুর বাড়ি নেত্রকোণা জেলার এক গ্রামে। দাদু বাড়ি অর্থির খুব পছন্দের জায়গা। এ বাড়ির প্রতি তার একটা নাড়ির টান আছে। কেননা দাদু বাড়ির পুকুরে প্রচুর মাছ আছে। এ বাড়ি আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি ও বিভিন্ন বনজ গাছে ঠাসা। বর্ষাকালে নৌকা করে বেড়ানো যায়। পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা যায়। গাছের ছায়ায় দোলনা বেঁধে সাথিদের নিয়ে খেলা করা যায়।

অর্থির দাদুর বাড়িতে পাকা লিচুর লোভে পরি বন্ধুরা এসে খেলা করত। কেননা বাড়ির সামনে ও পাশে পাঁচটি লিচু গাছ ছিল। রাতের বেলা পরি বন্ধুরা এসে জটলা করত। কেউ কেউ তাদের কথার ফিসফিস শুনেছে। জনশ্রুতি আছে, লালপরি, নীলপরি, হলদেপরিরা এখানে এসে আনাগোনা করত। আরো জানা যায়, অর্থির দাদু বাড়ির দিঘির পশ্চিম কোণের শিমুল আর শ্যাওড়া গাছে ভূতেরা এসে জটলা করত। ইতলে ভূত, বিতলে ভূত, মামদো ভূত, এক চোখ কানা ভূত প্রভৃতি। ছড়া কেটে বলা যায়–

ভারি অদ্ভুত ভাই ভারি অদ্ভুদ
পড়ার টেবিলে নাচে কতগুলো ভূত।
বিচ্ছিরি কালো ভূত
ধবধবে সাদা ভূত
উজবুক গাধা ভূত
এক চোখ কানা ভূত
লিকলিকে সরু ভূত।

অর্থির দাদু বাড়ির হলুদ খেতে হলুদ গাছের পাতায় টুনটুনি পাখি এসে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ত। এই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটাত। কোনোদিন রাত জেগে টুনটুনি পাখির বাচ্চা ধরা যেত। এজন্য দাদুর বাড়ি অর্থির খুব পছন্দ। অর্থির দাদুর বাড়িতে নারিকেল গাছ, পেয়ারা গাছ, আনারস গাছ, শসা গাছ, জাম্বুরা গাছ, আম-কাঁঠাল গাছ কোনোটার অভাব নেই। এজন্য পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা এ বাড়িতে আনাগোনা করে। অর্থির দাদু বলেন, পুকুরের পশ্চিম কোণে শিমুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দেখেছি যে, তিনটি ভূতের বাচ্চা আলোর মশাল নিয়ে খেলা করছে। সামনে এগোতেই এরা দৌড়ে পালালো। এটা ৪৭ বছর আগের ঘটনা।

অর্থির অন্য বন্ধুদের মধ্যে হুলো, মিনি ও পুষি। এরা এ বাড়িতে থাকে। এদের সাথে অর্থির খুব ভাব। অর্থি এদের মাছ, মাংস, দুধ খেতে দেয়। অনেক সময় এরা আবার অর্থির দাদির ঘর থেকে মাছ, দুধ চুরি করে খায়। বছরে দুবার ফুটফুটে বাচ্চা দেয়, দেখতে খুবই সুন্দর। প্রতিবারই মিনি ৪/৫টি করে বাচ্চা দেয়। মিনি অনেক সময় অর্থি দাদুর বিছানায় ঘুমায়। শীতের রাতে লেপ-কাঁথার নিচে আশ্রয় নেয়। ইঁদুর ধানের গোলা কেটে দেয়। অনেক সময় মাটিতে রাখা ধান গর্ত করে নিয়ে যায়। অর্থির বন্ধু মিনি এসব বড়ো বড়ো ইঁদুর ধরে নিয়ে আসে। এজন্য মিনিকে সবাই ভালোবাসে। অনেক সময় মিনি ছোটো পাখি ও ছোটো সাপ ধরে নিয়ে আসে।

অর্থি মা-বাবার সাথে ঢাকায় থাকে। একবার অর্থির দাদু-দাদা ঢাকায় বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে যায়। বাড়ি ফিরতে মাস-তিনেক দেরি হয়ে যায়। বাড়িতে কেউ নেই, ঘর তালাবদ্ধ এ সময়ে হুলো, মিনি, পুষি। অন্যত্র চলে যায়। অনেক সন্ধান করার পরও পাওয়া যায়নি। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ মিনি তিনটি বাচ্চা নিয়ে হাজির। দাদু তখন আদর করে তাদের খাবার দিল। মিনির আগমনে তখন সবাই খুশি। এভাবে কিছুদিন চলে যায়। হঠাৎ করে একদিন পাশের বাড়ির একটা পাগলা কুকুরের সাথে মিনির ঝগড়া লেগে যায়, এক পর্যায়ে কুকুরটা মিনির পায়ে কামড়ে ধরে। তখন মিনি খুড়ায়ে খুড়ায়ে ঘরের আড়ালে পাটখড়ির স্তূপের নীচে চলে যায়। দু'দিন পর দেখা গেল, মিনি সেখানে মরে পড়ে আছে। মিনি একটি বাচ্চা রেখে গেছে। বাচ্চাটি এখন বেশ বড়ো হয়েছে। সেদিন অর্থি এসে তাকে অনেক আদর করে খাবার দিয়েছে।

অর্থির খুদে বন্ধুরা, তোমাদের শুভেচ্ছা। অর্থির দাদুর বাড়ি এলে তোমরাও আসবে। তোমাদের পেলে তার গল্পের আসর ভালো করে জমে উঠবে। তোমাদের দাদু। ■

এক জোড়া স্যান্ডেল

সৈয়দ মনজুর কবির

উপজেলা শহর নবিনগর। পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে একটা রাস্তা নিলাদী গ্রামের দিকে চলে গেছে। সেই দিকেই সাত-আট বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দুহাতে তালপাতার তৈরি হাতপাখার বোঝা। এগুলো হচ্ছে অবিক্রিত হাতপাখা। মেয়েটির মা সেই সকালে বেরিয়েছিল পাখাগুলো বিক্রি করতে। ছোট্ট মেয়েটির বাবা পাখা বানায় এবং বিক্রি করে। কিন্তু বাবা বেশ অসুস্থ। মা-ই সেই কাজটি করছেন। আজ তেমন বিক্রি হয়নি। পাওয়া টাকার সবটুকু দিয়েই চাল, ডাল, আলু আর মেয়েটির অসুস্থ বাবার জন্য ঔষধ কিনেছেন। ছোট্ট মেয়েটির মা একটু সামনেই হেঁটে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছেন। মেয়েটি পাখাগুলো নিয়ে আসতে পারছে কিনা ! মেয়েটির জন্য বড়োই মায়া। স্কুল ছুটির পর মেয়েকে সাথে করে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিকেলে বাড়ির পথ ধরেছেন। ছোট্ট রাজকন্যা হাসি মুখে হেঁটেই চলেছে। কাঁধে ঝুলানোই আছে তৃতীয় শ্রেণির বই আর খাতায় ভর্তি ব্যাগ। মায়ের চোখ জলে ছল ছল। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আদরের মেয়েটির জন্য এক জোড়া স্যান্ডেল কিনে দিতে পারছেন না। খালি পায়েই এইটুকুন মেয়ে দুই কিলোমিটার পথ হেঁটে হেঁটে স্কুলে আসে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি লক্ষ করেছেন মেয়েটি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। পায়ে কিছু বিঁধল কিনা ভেবে মায়ের মন ব্যাকুল। একটু থেমে লক্ষ করে দেখেন। মেয়েটির বাম পায়ের গোড়ালিতে সামান্য একটু রক্তের দাগ। মেয়েটি এখন হাঁটতে পারছে দেখে চোখে জল নিয়েই আবার হাঁটা শুরু করেছেন মা।

এদিকে হয়েছে কী, মেয়েটির খুঁড়িয়ে হাঁটা কিন্তু আরেক জন খেয়াল করছিল। সে মিষ্টি করে ডাকল - এই যে ছোট্ট মেয়ে! এই ছোট্ট মেয়ে! এই যে এই দিকে আসো তো একটু। একটু কথা শুনে যাও তো!

ছোট্ট মেয়েটি তাকিয়ে দেখল– রাস্তার ধারে বসা এক মুচি। দুহাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে। মেয়েটিও দাঁড়ায়। মায়ের দিকে তাকাতেই দেখে মা এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বললেন – চলো তো মা শুনে আসি, লোকটি ডাকছে কেন ? দু'জনেই একত্রে লোকটির সামনে এসে দাঁড়ায়।

লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নবিনগরে এই একমাত্র মুচি। ওর বাবার মৃত্যুর পর পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মুচির কাজটা সঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। নাম রতন। একমাত্র ছেলেকে পড়ালেখা শিখিয়েছে। এখন মস্ত অফিসার। দুই বছর হলো ছেলে মাকে সঙ্গে নিয়ে বড়ো শহরে চলে গেছে। বাবাকেও সাথে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু চৌদ্দ পুরুষের ভিটা ছাড়তে নারাজ। একাই রাস্তার ধারে কাঁঠাল গাছের নিচে বসেন। মেয়েটি সামনে আসতেই আদরমাখা গলায় বললেন – এই যে ছোট্ট সোনা মা, স্কুলে পড়ো বুঝি ? কোন শ্রেণি? তোমার পা খালি কেন? তোমার তুলতুলে পা ব্যথা পেয়েছে? তোমাকে এক জোড়া জুতা যে

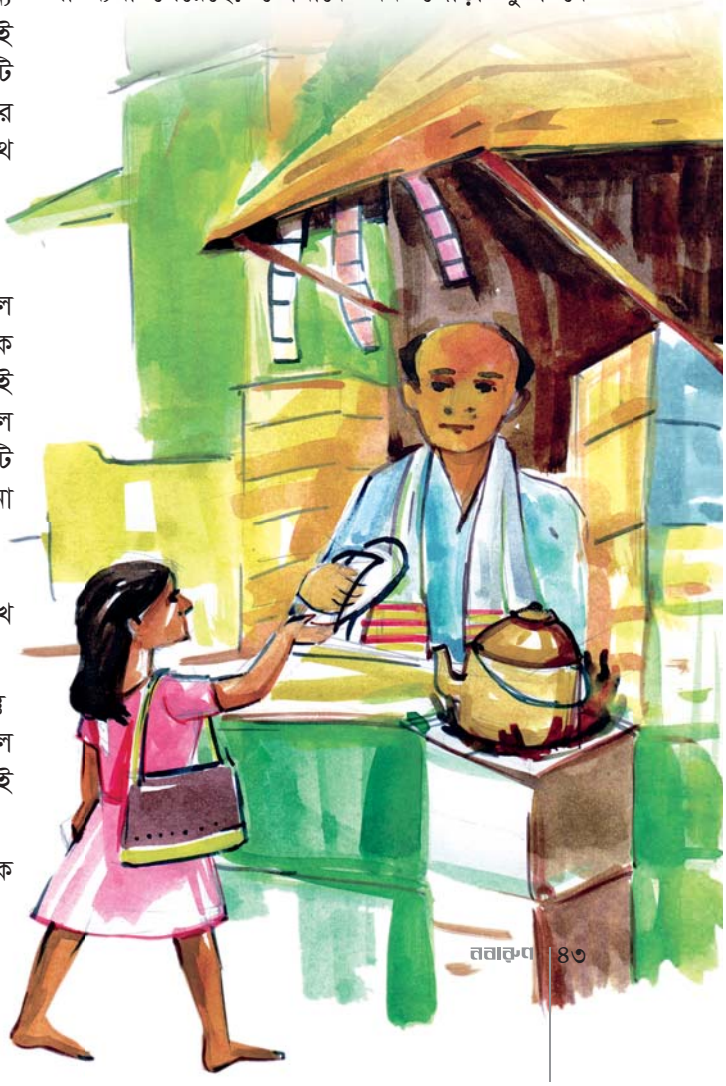

নিতেই হবে। যাও তো মা চাপকলটা থেকে পা ভালো মতো ধুয়ে আসো। আমার কাছে মলম আছে। সেই মলম লাগিয়ে দেই। আর পায়ের মাপ নিতে হবে না! তাড়তাড়ি যাও।

মা আর ছোট্ট মেয়েটি দম বন্ধ করে রতন দাদুর কথাগুলো শুনছিল। আবেগে দুজনের চোখেই জল চলে এল। বোঝা নামিয়ে ছোট্ট মেয়েটি পা দুটো পরিষ্কার করে আসে। রতন দাদু মলম লাগিয়ে দেন। পায়ের মাপ নিয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যেই কালো রঙের খুব সুন্দর এক জোড়া স্যান্ডেল বানিয়ে ফেলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন – দ্যাখোতো দেখি, কী সুন্দর স্যান্ডেল জোড়া তৈরি হয়ে গেল। নাও পরে নাও। খাঁটি চামড়া দিয়ে বানালাম রে মা। টিকবে অনেক দিন। ছোট্ট মেয়েটির পায়ে পরিয়ে দিলেন রতন দাদু স্যান্ডেল জোড়া।

ছোট্ট মেয়েটির চোখ-মুখ আনন্দে আলোকিত। আর থাকতে না পেরে কেঁদেই ফেলল। এক লাফে জড়িয়ে ধরল রতন দাদুকে।

বিশ বছর পর নবিনগর উপজেলা সদর হাসপাতালে জরুরি ওয়ার্ডে এক মায়াবী চেহারার মহিলা ডাক্তার রোগী দেখায় ব্যস্ত। দেশি-বিদেশি বড়ো বড়ো ডিগ্রি নেওয়া ডাক্তার। বড়ো শহর থেকে এসেছেন নিজের ছোট্ট শহরে মাত্র এক মাসের জন্য। রোগী দেখা শেষ করে সামনে দিয়ে যেতেই চোখ পড়ে বৃদ্ধ লোকটির উপর। জুবুথুবু বসে আছে কোনার একটি চেয়ারে। মাথাটা নিচের দিকে নামানো। কাছে গিয়ে আস্তে করে গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠে ডাক্তার। প্রচণ্ড জ্বর! হালকা গলায় জিজ্ঞাসা করে – দাদু, এত জ্বর নিয়ে এখানে বসে আছেন কেন? জরুরি ওয়ার্ডে ভর্তি হলেই হয়। আপনি একা এসেছেন? না, অন্য কারো সাথে এসেছেন? আপনার দ্রুত চিকিৎসা দরকার। চলুন বিছানায় শুইয়ে দেই। আমার হাত ধরুন, উঠুন।

বৃদ্ধ লোকটির চোখে জল চলে এল। ভালো থাকার জন্য সেই যে বউ- ছেলে চলে গেল, আর এল না। একাকিত্বের জীবনে কতদিন পর এমন মায়ার কথা শুনালো– কে সেই জন! দেখতে মাথা উঁচু করতেই ডাক্তার মেয়েটি আবারো চমকে ওঠে। মুখে বয়সের ছাপ বেশি থাকলে কী হবে, মুহূর্তেই চিনে ফেলল। সেই রতন দাদু। যাকে খুঁজতে এই কয়েক বছরে কয়েকবার এসেছিল। নবিনগরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাগুলো প্রশস্ত হয়েছে, কাটা পড়েছে সেই কাঁঠালগাছটিও। আসতেন ওই গাছের নিচের মুচি রতন দাদুর খোঁজ নিতে। কিন্তু কেউ কোনো তথ্যই দিতে পারেনি। বাড়ির ঠিকানায় গিয়েও শুনেছে বাড়িতেও ঠিকমতো আসেন না। ঘুরে বেড়ায় আর মানুষেরা দয়া করে যা দেয়, তাই খেয়ে বেঁচে আছে। এই মহিলা ডাক্তারটির এবারের ভিজিটটিও কিন্তু রতন দাদুর জন্য। সে রতন দাদুকে চোখের সামনে দেখে আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল– আরে দাদু ! তোমার একি অবস্থা! সেই যে স্যান্ডেল জোড়া দিলে, আমি তো লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে দেখি – বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। দ্রুত বড়ো হাসপাতালে না নিলে বাঁচানোই যাবে না। সেই রাতেই মা-বাবার সাথে আমিও চলে যাই। বাবার চিকিৎসা হয় প্রায় মাস খানিক ধরে। আমি বাবার পাশে থাকতাম আর সুযোগ পেলেই বই পড়তাম। সেখানেই এক বড়ো ডাক্তার আমার পড়ালেখার আগ্রহ দেখে খুব খুশি হন। বাবার দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখার জ্ঞান ছিল। সুস্থ হলে ওই ডাক্তারই বাবাকে প্রাইভেট চেম্বারে একটা কাজ দেন আর আমাকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। আর গ্রামে কেউ ছিল না, তাই গ্রামে ফিরে আসা হয়নি। দাদু, আপনার চেহারা আমার মনে গেঁথে আছে।

আপনার এ অবস্থা কেন? আবার জিজ্ঞেস করল। রতন দাদু ফ্যালফ্যাল করে ছোট্ট সোনা মায়ের মুখের দিকে শুধু চেয়েই থাকে, মুখে কিছুই বলল না। আঠারো দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। রতন দাদুর চিকিৎসা সম্পন্ন করেছে ধীরে সুস্থে। খুবই জটিল অপারেশন করতে হয়েছে। যা কিনা এই উপজেলা হাসপাতালে করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। ডাক্তার দাদুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই পবিত্র হাসিমুখে। রতন দাদু আগের মতোই নির্বাক। শুধু চেয়ে আছেন ফ্যালফ্যাল করে সোনা মায়ের দিকে। সোনা মা বলছে - দাদু, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আজই আপনি বাড়ি যাবেন। আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। আর একটা কথা, আপনার বাড়ির আশেপাশে অনেক দোকান হয়েছে। আপনাকে না জানিয়েই রাস্তার ধারে আপনার জমির উপর জুতার একটা দোকান গড়েছি। একটা ছোট্ট স্যান্ডেল জুতার দোকান। আপনি দাদু রাগ করবেন না। আমি জানি আপনার চেয়ে ওটা কেউ ভালো চালাতে পারবে না। ■

সিন্দুক রহস্য

অবনিল আহমেদ

লোকটার পুরো নাম সরোজ চন্দ্র ঘোষ। এলাকার সবচেয়ে বড়ো ধনী। সরোজ সাহেবের মেয়ের বিয়ে। গ্রামের সবাই লাফিয়ে উঠল। হইহল্লা পড়ে গেল সারা গ্রামে। সরোজ সাহেবের মেয়ের বিয়ে বলে কথা!

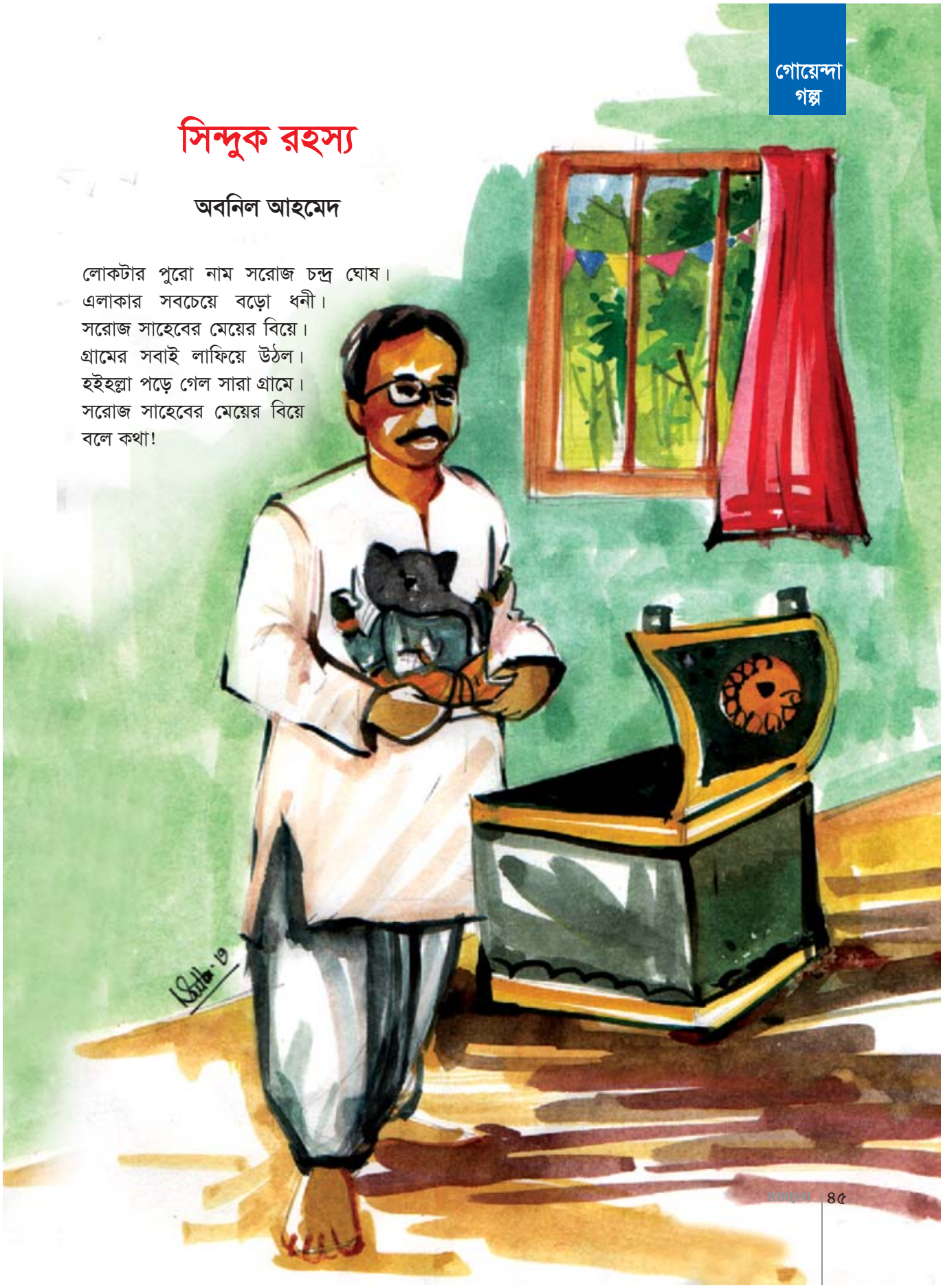

পুরো গ্রামের লোককে দাওয়াত করে খাওয়াবেন তিনি। বিয়ের জন্য ঠাকুরের নতুন মূর্তি আনলেন। কনের গয়না ও সব টাকাপয়সা সিন্দুকে পুরে রেখেছেন। কিন্তু সিন্দুকের ঢাকনা খুলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সরোজ সাহেব। সিন্দুকের ভেতর একটু ধুলোবালিও নেই। সবটাই ফাঁকা।

সাথে সাথে তার স্ত্রী পুলিশকে ফোন করেন। পুলিশের একটি দল ছুটে এল সরোজ সাহেবের বাসায়। ইনভেস্টিগেশন শুরু হলো। এই গ্রামে বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য এসেছিলেন সিনিয়র গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মাহবুব মরশেদ। সাথে আছে সাম্য ও একজন বিশেষ গোয়েন্দা। সাম্য বলল, সবার আগে সিন্দুকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হোক। আমি বাড়ির গার্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসি।

বাড়ি থেকে কাউকে বের হতে দেওয়া হলো না। সবাইকে সার্চ করা হলো। কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর সাম্য গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে, অতিথি ও বাবুর্চি বাদে আর কেউ এসেছিল এই বাড়িতে?

গার্ড বলল, না আসেনি। কিন্তু একজন অতিরিক্ত বাবুর্চি এসেছিল, যে এই ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ আগে একটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যায়।

সাম্য জিজ্ঞাসা করে, তার নাম কী ছিল, সে কোথায় থাকে কিছু জানো তার সম্পর্কে?

গার্ড বলল, হ্যাঁ, তার সাথে আমার কথা হয়েছে। সে বলল, তার নাম চরণ দাস। আর সে পাশের গ্রাম থেকে এসেছে। কিন্তু স্যার, আমার তার মুখের ভাষা শুনে মনে হলো যে সে বরিশাল অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে।

বলতে বলতে সিন্দুক থেকে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো চলে এসেছে। বাড়ির লোকজন বাদে আরেকটি অতিরিক্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। তার মানে সেটা চোরের। সাম্য বাবুর্চিদেরকে জিজ্ঞেস করল যে চরণ দাস নামে কোনো অতিরিক্ত বাবুর্চি এসেছিল কিনা। কিন্তু বাবুর্চিরা বলে, না। তারপর সাম্য গার্ডের কাছে আবার আসে। আর আসতে গিয়েই দেখে একটা নতুন ঠাকুরের মূর্তি। তখনই সাম্যর মনে হলো যে চরণ দাস তো হিন্দু। নিশ্চয়ই ঠাকুরের মূর্তিতে স্পর্শ করে প্রণাম করেছিল। কারণ এই বাড়িতে যেই হিন্দুই প্রবেশ করুক না কেন, ঠাকুরের মূর্তিতে স্পর্শ করে প্রণাম করে যেতে হয়। এইটা এই বাড়ির নিয়ম।

তখনই সাম্য পুলিশদেরকে বলল, ঠাকুরের মূর্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট বের করতে। আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট বের করতেই দেখা যায়, সিন্দুকে পাওয়া চোরের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করেছে সেটা চরণ দাসেরই। আর মাহবুব মরশেদ একটা লঞ্চের টিকিট পেয়েছেন যেটা আর আধা ঘণ্টার মধ্যে বরিশালে রওনা দিবে।

সাম্য বলল, তাহলে তাড়াতাড়ি লঞ্চঘাটে চলো, সে নিশ্চয়ই আরেকটা টিকিট কিনে লঞ্চে করে যাবে।

ওরা খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ ঘাটে পৌঁছাল আর ওদের সাথে ছিল সেই সরোজ চন্দ্রের বাড়ির গার্ড। কারণ সে-ই শুধু চরণ দাসকে দেখেছে। লঞ্চঘাটে পৌঁছাতেই গার্ড চরণ দাসকে দেখতে পেল। চরণ দাস একটা ব্যাগ হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তখনই পুলিশ তাকে ধরে ফেলল আর গয়নাগাটি ও টাকাপয়সা উদ্ধার করে সরোজ সাহেবকে দিল। সবশেষে মাহবুব মরশেদ বলল, আসলেই সাম্যর জবাব নেই। ■

বৃষ্টি

মো. মুশফিকুর রহমান (মিদুল)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ঘরের চালে মাথার উপর
ঝম ঝমা ঝম শব্দ করে
টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে।

চারিদিকে ঝড়ের বেগে
বৃষ্টি যেন আসছে রেগে
ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি পড়ে
মাঠঘাট সব জলে ভরে।

বৃষ্টির ভারে ক্লান্ত হয়ে
গাছগাছালি পড়ছে নুয়ে।
বৃষ্টি যখন আসে তেড়ে
দৌড়ে কৃষক ছুটছে ঘরে।

৭ম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মিঠির জাদুর কলম

জ্যোৎস্নালিপি

ভোরে উঠেই মিঠি মিষ্টি সুরে হারমোনিয়ামে সা রে গা মা পা ধরেছে। আজ মিঠির স্কুল ছুটির দিন। তাই আজকের দিনের মজাই আলাদা। প্রতিদিন ভোরে উঠে মিঠি গলা সাধে, ছাদের বাগানের ফুল গাছে পানি দেয়, পোষা বিড়ালটাকে আদর করে। কবুতরকে শস্য দেয়। তারপর নাশতা করে স্কুলে চলে যায়। এটা তার সব সময়ের রুটিন। স্কুল খোলার দিনগুলোর চাইতে ছুটির দিনের রুটিন আলাদা। আর এখন তো শীতকাল। শীতকালেও ভোরে ওঠে মিঠি। একটুও অলসতা নেই

তার। ছাদের বাগানের ফুল গাছের ওপর যে কুয়াশা পড়ে সেটা সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, মুখে মাখে, বুকভরে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। কারণ মা বলেছে সকালের বাতাসে ফ্রেশ অক্সিজেন পাওয়া যায়। তারপর সারাদিনে কী কী করবে তার একটা ছক করে নেয় মনে মনে।

মিঠির বড়ো মামা থাকে জাপানে। অনেক বছর হলো তিনি সেখানে গিয়েছেন। মিঠির জন্মের পর তার দেশে আসা হয়নি। মিঠির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে শুধু ভিডিও কলে। প্রতি জন্মদিনের মতো এবারের জন্মদিনেও মামা গিফট পাঠাবে, এটা মিঠির জানা কথা। কিন্তু রবিবার যখন মামার সঙ্গে কথা হলো তখন মামা মিঠিকে বলেছে এবার যে গিফটটা মিঠি পাবে তাতে একটা সারপ্রাইজ থাকবে। মিঠি মামার কাছে বারে বারে জানতে চেয়েছে, বলো না মামা, কী সারপ্রাইজ থাকবে? মামা বলেছে, বলে দিলে সারপ্রাইজ কি আর সারপ্রাইজ থাকেরে বুদ্ধু! মিঠি অভিমানের সুরে বলে, আমাকে বুদ্ধু বলবে না মামা। আমি স্কুলের সেকেন্ড গার্ল– তার মানে আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। মামা দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বলে, ও তাই বুঝি! তাহলে তুমি বুদ্ধি করে বের করো সারপ্রাইজ গিফট কী হতে পারে! মিঠি বলে, জামা? বারবি ডল? চকলেট? মামা না-সূচক মাথা নাড়ে। আচ্ছা মিঠি তোমার তো গাছপালা খুব পছন্দ।

কেন মামা?

না এমনি বললাম। তোমাদের ছাদ বাগানে কী কী ফুলের গাছ আছে?

অনেক অনেক ফুল মামা। দেখবে? ও হো এখন তো রাত হয়ে গেছে, ছাদে যে লাইট দেওয়া আছে সেই অল্প আলোতে তো তুমি দেখতে পাবে না মামা। আচ্ছা আজ থাক, আরেকদিন দেখাব। মামা তুমি কিন্তু বললে না কী গিফট দেবে। মামা বলে, আমার বুদ্ধিমতী ভাগনিটাকে তো ইঙ্গিত দিয়েছি– দেখি সে কী করে বের করে। আচ্ছা এখন ঘুমোতে যাও। কাল তো তোমার স্কুল আছে মিঠি।

আচ্ছা মামা।

মামা ঘুমাতে বললেও মিঠির ঘুম আসে না। মামা কী বলল! কী গিফট হতে পারে! মিঠি কিছুতেই মামার কথার রহস্যভেদ করতে পারে না। মামা কেন গাছের কথা বলল? তাহলে মামা কী কোনো বিদেশি ফুলের গাছ পাঠাবে? তাহলে তো ভালোই হবে। মিঠি খুশি হয়, কারণ ফুল গাছ মিঠির খুব পছন্দ। তারপরও জন্মদিনে জাপান থেকে ফুলের গাছ! মিঠির বিশ্বাস হতে চায় না। ভোরের দিকে মিঠির চোখ আর মিঠিকে জেগে থাকতে দেয় না। জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। একি! মামা এসেছে জাপান থেকে। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মামা, এটাই বুঝি তোমার সারপ্রাইজ ছিল। মামা মাথা নেড়ে বলে, না, এটা নয়।

তাহলে কী মামা? তুমি আসার চেয়ে আর কী বেশি সারপ্রাইজ হতে পারে। মামা তার বিশাল ব্যাগ থেকে অনেক গিফট বের করে– চকলেট, জামা, পুতুল আরো অনেক কিছু। তারপরও যেন মিঠি অবাক হয় না। মনে হয় এটা সেই সারপ্রাইজ গিফট নয়। মামা বলে, মিঠি তোমাকে এবার আমি জাপানে বেড়াতে নিয়ে যাব। তোমার পাসপোর্ট আছে তো? মিঠি বলে, আছে। গত বছরই তো আমরা নেপালে গিয়েছিলাম বেড়াতে।

ও তাই বুঝি! আমাকে বলোনি তো।

বলেছি মামা, তোমার খুব ভুলো মন, ভুলে গেছ।

আচ্ছা আর ভুলব না।

কিন্তু মামা তোমার সারপ্রাইজ গিফট তো আমায় দিলে না?

কী সারপ্রাইজ গিফটরে মিঠি। শরীর খারাপ নাকি। কোনোদিন তো এমন দেরি করে ঘুম থেকে উঠিসনি। মিঠি ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসে। ঘুম থেকে জাগেনি দেখে মা এসেছে মিঠির ঘরে।

মা, জাপান মামা কোথায়? জাপানে থাকে বলে মামাকে সে শিশুবেলা থেকেই জাপান মামা বলে ডাকে।

জাপান মামা? সে আসবে কোথা থেকে।

এখানে ছিল মা। আমার জন্য কত গিফট এনেছে। মা

মিঠির কপালে হাত দিয়ে বলে, না, গা তো গরম নেই।

মা বলো না, মামা কোথায়?

ও বুঝেছি, তুই স্বপ্ন দেখছিলি।

তাই হবে মা, কিন্তু আমার স্কুলের তো দেরি হয়ে গেল। এখন কী হবে মা?

মা অভয় দিয়ে বলেন, কিচ্ছু হবে না। একদিন স্কুলে না গেলে কিচ্ছু হবে না। রবীন্দ্রনাথ তো কত স্কুল ফাঁকি দিত। আমিও ফাঁকি দিতাম– বলে মা মিঠির গালে আদর করে দেয়।

মিঠি ছাদে গিয়ে বাগান পরিচর্যা করে। টবে অনেক গাঁদা ফুল ফুটেছে। মিঠি মোবাইল ফোনে ফুলের ছবি তোলে। মিঠিদের ছাদে বাবা কবুতরের জন্য কাঠ দিয়ে ছোটো ছোটো ঘর তৈরি করে দিয়েছে। কবুতরগুলো মিষ্টি সুরে বাকবাকুম করে ডাকে। কয়েকটা কবুতর সকালের মিষ্টি রোদ পোহায় মিঠির সঙ্গে। মিঠি ওদের শস্যদানা খেতে দেয়। খাবার খেতে ঘর থেকে আরো অনেকগুলো কবুতর বেড়িয়ে এসে মিঠিকে ঘিরে ধরে। মিঠির বেশ মজা লাগে। মিঠি বলে, তোরা তো দেখি অনেক পেটুক, খাবার দেখেই ছুটে এলি। কবুতরগুলো বাকবাকুম বাকবাকুম করে ডাকে। একটা তো মিঠির ঘাড়ের ওপর উঠে বসে। মিঠি বলে, আচ্ছা তোরা বলতে পারবি মামা আমার জন্য কী সারপ্রাইজ গিফট আনবে? কবুতর বলে, বাকবাকুম। মিঠি হাসে। তোরা সব বুদ্ধু। মিঠিদের বিড়ালটাও এরই মধ্যে এসে তার পিছু পিছু ঘোরে আর মিউ মিউ করে।

অবশেষে জাপান থেকে মিঠির সারপ্রাইজ গিফট এসে পৌঁছায়। ছোট্ট একটা প্যাকেট। মিঠির অস্থির লাগছে। কী থাকতে পারে প্যাকেটটায়! মিঠি প্যাকেট খুলে অবাক হয় এবং একই সঙ্গে খুব মন খারাপ হয় তার। একটা কলম পাঠিয়েছে মামা। এই তাহলে মামার সারপ্রাইজ গিফট! কলমটা দেখতে মন্দ না হলেও মিঠির চোখ আর কান্নাকে আটকাতে পারে না। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সে মনে মনে ভেবে নেয়, জাপান মামার সঙ্গে আর কথা বলবে না সে। জন্মদিনে মামা ফোন করলেও মিঠি ভালো করে মামার সঙ্গে কথা বলে না। মামা তবুও বলে, গিফট পছন্দ হয়েছে মিঠি। কলম নিয়ে আরো অনেক কিছু বলতে চায় মামা। আর কিছু না শুনেই মিঠি ফোন রেখে দেয়।

বেশ কিছুদিন হলো মিঠির জন্মদিন পার হয়েছে। মামার দেওয়া জাপানি কলমটার কালি শেষ হওয়াতে ছাদের কোথায় যেন ফেলে দিয়েছে সে। এতদিনে অভিমান খানিকটা ভুলেও গেছে মিঠি। সব নিয়ম করেই চলছে তার– স্কুলে যাওয়া, বাগান পরিচর্যা সবকিছু। ছুটির দিনগুলোতে মিঠি ছাদ বাগানে বেশি সময় দেয়, তেমনি একদিন সে ফুল গাছে পানি দিচ্ছিল। হঠাৎ একটা খালি টবের কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে যায়। এ কী দেখছে সে! এ তো মামার দেওয়া সেই জাপানি কলমটা। যেটাতে কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে ফেলে দিয়েছিল। সেটাতে সবুজ সবুজ পাতা গজিয়েছে। এটা কী করে সম্ভব? কলম কী করে গাছ হয়ে গেল? তাহলে মামার কথাই তো ঠিক। মামা তো সত্যিই মিঠিকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল। সেদিন মিঠি মামার কথা ভালো করে শুনতে চায়নি। এটা তো জাদুর কলম। মিঠি সবাইকে ছাদে ডেকে নিয়ে আসে। কলমটা থেকে কী সুন্দর সবুজ সবুজ পাতা গজিয়েছে। মিঠি রাতে মামাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানায়। মামা বলে, জাদুর কলম তোমার পছন্দ হয়েছে তো মিঠি? মিঠি মিষ্টি করে হেসে বলে, খুব খুব মামা। মামা বলে, সারপ্রাইজ তো এখনো শেষ হয়ে যায়নি। জাদুর কলম বলে কথা!

কদিন বাদেই মিঠি দেখে জাদুর কলম থেকে বের হওয়া গাছ খানিকটা বড়ো হয়েছে। মিঠি সকাল-বিকাল জাদুর কলমের খোঁজ নেয়। আজও ছুটির দিনে মিঠি ভোরে ছাদে এসেছে। সে আরো অবাক হয়, জাদুর কলম গাছে তিন রঙের তিনটি ফুল ফুটেছে। আর শীতের শিশির পড়ছে সেই তিনরঙা ফুলের ওপর। মিঠি তাতে হাত ছোঁয়ায়। ফুলগুলো হেসে ওঠে। সঙ্গে মিঠিও। ■

ভাষা-দাদুর সঙ্গে

পিটপিট, খাঁ খাঁ, ছমছম

তারিক মনজুর

পিল্টু বিজ্ঞানে খুব ভালো। ক্লাসে সবার চেয়ে বেশি নম্বর পায় বিজ্ঞানে। প্রায়ই নতুন নতুন জিনিস বানায় সে। আর সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

কিছুদিন আগে পিল্টু ব্যাটারি নিয়ে ভাবছিল। ছোট্ট একটা জিনিস। কিন্তু কী দারুণ শক্তি। খেলনা গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে গাড়ি চলতে থাকে। পুতুলের পিঠে বসিয়ে দিলে পুতুল কাঁদতে পারে। ঘড়ির পিছনে ব্যাটারি না দিলে ঘড়িই চলে না।

এই রহস্যের খানিকটা সমাধান সে বের করতে পেরেছে। আসলে ব্যাটারির থাকে দুটি প্রান্ত। একটা হলো ধনাত্মক, আরেকটা হলো ঋণাত্মক। এক প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎশক্তি আরেক প্রান্তে যায়।

পিল্টু বিজ্ঞানে এত ভালো। অথচ ব্যাকরণ দেখলেই তার গায়ে জ্বর আসে। আর জ্বর আসবেই না কেন? এই সেদিন সে দেখল, ব্যাকরণের মধ্যেও আছে ধনাত্মক শব্দ। কী অবাক কাণ্ড! ব্যাকরণ কি কোনো ব্যাটারি যে এর মধ্যে ধনাত্মক শব্দ থাকবে? আচ্ছা, ধনাত্মক শব্দ আছে ভালো কথা, তাহলে ঋণাত্মক শব্দ নেই কেন? অনেক খুঁজেও সে ব্যাকরণ বইতে ঋণাত্মক শব্দ পেল না।

এদিকে কয়েকদিন পরেই পরীক্ষা।

ব্যাকরণের কয়েকটা অধ্যায় সে নিজে নিজেই পড়ে ফেলল। মোটামুটি বুঝতেও পারল। কিন্তু ধনাত্মক শব্দ তাকে বেশ কষ্ট দিতে লাগল। বুঝতে পারল, বিষয়টা নিয়ে ভাষা-দাদুর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

ভাষা-দাদু প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে বের হন। বেশি দূর তিনি যান না। স্কুলের মাঠটা তিনবার ঘোরেন শুধু। তারপর পুকুর পাড় দিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে চলে যান। পিল্টু ভাবল, ভোরবেলাতেই তাঁকে ধরতে হবে।

যেই ভাবা, সেই কাজ। পরদিন ভোরে পুকুর পাড়ে ঠিক দাদুকে ধরে ফেলল পিল্টু। ভূমিকা না করে সরাসরি প্রশ্ন করল সে, 'আচ্ছা দাদু, বাংলা ভাষাও কি ব্যাটারির মতো?'

ভাষা-দাদু কী বুঝলেন, কে জানে। তিনি হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তা বলতে পারো। ব্যাটারির শক্তি আছে; বাংলা ভাষারও তো শক্তি আছে।'

'তাহলে দাদু, বাংলা ভাষায় ধনাত্মক শব্দ আছে। ঋণাত্মক শব্দ নেই কেন?'

এবার দাদু আসল সমস্যা ধরতে পারলেন। পিল্টুকে নিয়ে পুকুরের ধারে বসে পড়লেন। হাতের লাঠিটা পাশে রেখে লম্বা একটা দম নিলেন। তারপর বললেন, 'ব্যাটারিতে ধনাত্মক-ঋণাত্মক আছে। কিন্তু শব্দের মধ্যে ধনাত্মক-ঋণাত্মক নেই।'

পিল্টু প্রতিবাদ করে ওঠে, 'তা কী করে হয়? আমাদের ব্যাকরণ বইতেই তো ধনাত্মক শব্দ আছে।' তারপর আমতা আমতা করে বলে, 'তবে ঋণাত্মক শব্দ আমি খুঁজে পাইনি।'

দাদু বললেন, 'বাংলা ভাষায় ঋণাত্মক শব্দ বলে কিছু নেই। ধনাত্মক শব্দও আসলে নেই। যা আছে, তাকে বলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ।'

'মানে?' পিল্টু কিছুই বুঝতে পারে না। 'মানে ধনাত্মক আর ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুটো এক না। বানান আর উচ্চারণে অনেক তফাত।'

'ধনাত্মক ... আর ধ্বন্যাত্মক!' পিল্টু কয়েকবার বিড়বিড় করে।

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাথে রয়েছে ধ্বনির সম্পর্ক। তাই এগুলোর নাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ। এই ধ্বনি কার কার দ্বারা তৈরি হয় বলতে পারো?'

পিল্টু বলা শুরু করে, 'ধাতব পদার্থে আমরা যখন বাড়ি দেই, তখন ওই পদার্থের অণু কাঁপতে শুরু করে। এরপর বাতাসের ভিতর দিয়ে ...'

ভাষা-দাদু হাসতে থাকেন। বলেন, 'বিজ্ঞানী পিল্টু, আমি অত কঠিন করে উত্তর শুনতে চাইনি। ধ্বনি তৈরি হয় মানুষের দ্বারা। জানতে চাচ্ছিলাম, আর কীসের কীসের মাধ্যমে ধ্বনি তৈরি হয়?'

পিল্টু বলল, 'ও এই কথা! ধ্বনি তৈরি হয় মানুষের দ্বারা ... তারপর জীবজন্তুর দ্বারা, বস্তুর দ্বারা ...।'

'কয়েকটা করে নমুনা বলতে পারো? এই যেমন, মানুষের হাসির ধ্বনি – হি হি, কাশির ধ্বনি – খক খক।'

দাদুর কথার সূত্র ধরে পিল্টু বলতে থাকে, 'মানুষের ধ্বনি – হি হি, খক খক। জীবজন্তুর ধ্বনি – কা কা, ঘেউ ঘেউ। বস্তুর ধ্বনি – ঢং ঢং, ঝন ঝন।'

'বাহ্, বেশ!' ভাষা-দাদু খুশি হন। তারপর হাতের লাঠিটা খুঁজতে খুঁজতে উপসংহার টানেন, 'ধ্বনি থেকে পাওয়া এসব শব্দকেই বলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ। মানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ তুমি কানে শুনতে পাবে।'

পিল্টু প্রশ্ন না করে পারে না। সে বলে, 'তাহলে আমাদের ব্যাকরণ বইতে পিটপিট, খাঁ খাঁ, ছমছম – এগুলোকেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলেছে কেন? এগুলো কি ধ্বনি? মানে কানে শোনা যায়?'

ভাষা-দাদু লাঠিটা হাতে নিয়েছেন। তিনি উঠেই পড়লেন। বোঝা গেল, এখন তার ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। বললেন, 'পিটপিট, খাঁ খাঁ, ছমছম – এগুলোর মতো আরো অনেক শব্দ আছে। সেসব শব্দ আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয়। এসব শব্দকেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে।' ■

রোমানের সাফল্য যাত্রা

মেজবাউল হক

রোমান সানা নামটি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বেশ আলোচিত। এই আর্চার তাঁর নৈপুণ্য দিয়ে চোখ কেড়েছেন সবার। গত ১৩ই জুন হল্যান্ডে বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে বিশ্বের নামিদামি আর্চারদের হারিয়ে উঠে যান সেমিফাইনালে। এতেই তিনি পেয়ে গেছেন আগামী বছর টোকিও অলিম্পিকে সরাসরি টিকেট। গলফার সিদ্দিকুর রহমানের পর রোমান সানা-ই প্রথম বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদ, যিনি অলিম্পিকে খেলবেন নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে।

সেই রোমান আবার নতুন করে উঠে এলেন আলোচনায়। ১৩ই সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ র‍্যাংকিং টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে স্বর্ণপদক জিতে দেশকে গর্বিত করেছেন আর্চার রোমান সানা। ফিলিপাইনের ক্লার্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে চীনের শি ঝেনকিকে ৭-৩ ব্যবধানে হারিয়েছেন রোমান।

প্রথম সেটে ২৮-২৮ পয়েন্টে ড্র করেন রোমান ও শি। দ্বিতীয় সেটে ২৯-২৬ পয়েন্টে হেরেই বসেন রোমান। এরপর স্বরূপে ফিরে আসেন তিনি। তৃতীয় সেটে ২৭-২৫ ব্যবধানে জয় তুলে নেন। তৃতীয় সেটে পাওয়া আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে চতুর্থ সেটে ২৮-২৫ ব্যবধানে জয় পান রোমান। এরপর শেষ সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ২৮-২৭ পয়েন্টে জিতে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের এই তারকা আর্চার।

স্বর্ণপদক জয়ের পর উচ্ছ্বসিত রোমান বলেন, আমি ভীষণ খুশি। এমন একটি অর্জনের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। সেটারই ফল পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ আমার কোচের কাছে, যিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনকে, যারা আমাকে সমর্থন দিয়েছে।

এশিয়া কাপ আর্চারিতে স্বর্ণ জয়ের পর দেশে ফিরলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ডেকে পাঠান রোমানকে। শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই তিরন্দাজকে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর মনোযোগ দিয়ে রোমানের আর্চার হওয়ার গল্প শুনেছেন। রোমানকে দিয়েছেন আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি। এছাড়াও রোমানের মায়ের চিকিৎসার ব্যাপারেও দিয়েছেন আশ্বাস। নবারুণের পক্ষ থেকে এই ক্রীড়াবিদকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ■

নতুন বই
সাথে নতুন জামা

মাকসুদ তারেক

নতুন বছর ,নতুন বই ,নতুন জামা –কেমন লাগবে বলো তো বন্ধুরা? নিশ্চয়ই শুনে অনেক খুশি লাগছে তাই না! আর যদি পেয়েই যাও তবে তো শিক্ষার আকাশে ডানা মেলতে ষোলোকলা পূর্ণ হয়। তোমাদের মনের ইচছা পূরণ করতে আলাদীনের দৈত্যর মতো সরকার এক বিরল পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী বছর থেকে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেসের জন্য দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন।

কুড়িগ্রামে এক মতবিনিময় সভায় ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকার মেধাবী জাতি গঠনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই আগামী বছরের শুরুর দিন দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বইয়ের পাশাপাশি স্কুল ড্রেসের জন্য দেওয়া হবে দুই হাজার টাকা।' । আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান নিশ্চিত করতে সরকারের এতসব আয়োজন। কুড়িগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিততকরণে পরীক্ষামূলকভাবে এক শিফটের বিদ্যালয়ের সময়সূচির (ক্লাস রুটিন) উদবোধন করেন প্রতিমন্ত্রী। এ সূচি অনুযায়ী বিদ্যালয়ে এখন থেকে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শরীরচর্চা ও ১০টায় ক্লাস শুরু হবে। ৪৫ মিনিট ক্লাস করার পর ১৫ মিনিট বিরতি। এ সময় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে পড়াবেন। আর ছুটি হবে বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে।

স্কুল মিলনীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে এক বেলা খাবার দেয়া হবে। খাবার হিসেবে থাকবে বিস্কুট, রান্না করা খাবার বা ডিম, কলা। এই ব্যবস্থা রেখে 'জাতীয় স্কুল মিলনীতি-২০১৯-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। মিড ডে মিল অনেক জায়গায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু হয়েছে। এগুলোকে কীভাবে সমন্বিতভাবে সারাদেশে ছড়ানো যায় সেজন্য এই নীতিমালা। নীতিমালায় চর এবং হাওর এলাকার প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। জেলা পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসন এ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত থাকবেন।

প্রতিদিন স্কুল মিলের স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে ডাল, পুষ্টি তেল এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মৌসুমি তাজা সবজি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ডিম দিয়ে করা হবে। যাতে শিশুদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার ৩০ শতাংশ ক্যালরি এবং অপরিহার্য অনুপুষ্টিকণা, পর্যাপ্ত প্রোটিন এবং চর্বির চাহিদা স্কুল মিল থেকে আসে। যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩-১২ বছরের ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে। লক্ষ করা গেছে এ কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় ঝরে পড়ার হার ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হ্রাস পায় এবং শারীরিক অবস্থারও উন্নতি হয়। এই বিবেচনায় জাতীয় স্কুল মিল কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে মন্ত্রিসভায়। বতমানে সারা দেশে ৬৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আছে ১ কোটি ৪০ লাখ। এখন থেকে বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ■

দাবায় সুরভি ছড়াচ্ছে খুশবু

জান্নাতে রোজী

ঢাকার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ইংলিশ মিডিয়ামে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া খুশবু'র সুরভি এরই মধ্যে দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছে গেছে। এই এতটুকু বয়সেই তার ঝুলিতে জমা হয়েছে অনেক

অর্জন। ২০১৮ সালে কলকাতায় টেলিগ্রাফ স্কুল দাবায় অনূর্ধ্ব-৬ বছর ক্যাটাগরিতে হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। উজবেকিস্তানে পশ্চিম এশিয়া যুব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্লিৎজ দাবায় সোনার পদক জয় করে নেয় খুশবু। থাইল্যান্ডে এশিয়ান যুব চ্যাম্পিয়নশিপে ১টি সোনা ও ২টি রূপার পদকও জিতেছে সে। এবছর ২৭শে জুন উজবেকিস্তানের তাসখন্দে এশিয়ান স্কুল দাবায় চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-৭ বছর ক্যাটাগরিতে র‍্যাপিড ও স্ট্যান্ডার্ড বিভাগে খুশবু জিতেছে সোনা আর ব্লিৎজে বিভাগে রূপা।

মেহেদি কায়সার ও শাহিদা আক্তারের একমাত্র মেয়ে ওয়ারশিয়া খুশবু। বছর দু-এক আগে বাবার সঙ্গে দাবা খেলায় হাতেখড়ি খুশবুর। একদিন স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে কে দাবা শিখতে চাও? কিছু না বুঝেই খুশবু হাত তুলেছিল। এরপর স্কুল থেকেই ধীরে ধীরে দাবা খেলাটা শিখে ফেডারেশনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে। শেখ রাসেল জাতীয় স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় সে। এর পরের গল্প শুধুই সাফল্যের। এই বয়সের বাচ্চারা যখন মুঠোফোন আর ল্যাপটপে গেমস খেলায় মত্ত, টিভিতে কার্টুন দেখায় ব্যস্ত, খুশবু তখন মেতে উঠেছে রাজা-মন্ত্রী, হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাদা-কালো বোর্ডের চৌষট্টি ঘরের এই অনন্য খেলায়। পড়াশোনাও চলছে পুরোদমে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে অর্ধেক বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও এখন বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছে খুশবু।

ছোট্ট খুশবু বাংলাদেশের দাবায় যে খুশবু ছড়ানো শুরু করেছে তা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে এশিয়ার অন্য দেশগুলোতেও। নবারুণের মাধ্যমে শুভ কামনা জানাই ফুলের সৌরভ ছড়ানো খুশবুকে।

সেভ দ্য চিলড্রেনের যুব দূত হলেন ফুটবলার সাবিনা

বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার নারী ফুটবলার এবং দেশের ফুটবলের আইকন সাবিনা খাতুনকে সেভ দ্য চিলড্রেনের ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৮ই আগস্ট বাফুফেতে এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়। এক বছরের জন্য সাবিনাকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়। সেভ দ্য চিলড্রেনের 'সূচনা' নামের একটি প্রোগ্রাম রয়েছে যেটি নারীদের বিশেষ করে পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের কিশোরীদের নিয়ে করে। নারী মুক্তির এই প্রোগ্রাম-এর সূচনাতেই কাজ করবে সাবিনা খাতুন। নারীর বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা, অপরিণত

বয়সে বিয়ে হওয়া, সমাজে প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়, জীবন চলার পথে নানা বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র মাথায় নিয়ে কীভাবে উন্নতির সিঁড়িতে উঠতে হয় সেই অভিজ্ঞতা আর অধিকারের কথা তুলে ধরবেন সাবিনা। ■

ভালো কথা, ভালো উপদেশ কখনো পুরনো হয় না। হোক এগুলো শিক্ষামূলক কিংবা জীবনভিত্তিক। কোনো একটি উক্তি তোমার জীবন বদলে দিতে পারে, তৈরি করতে পারে একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিবার, সমাজ বা দেশের জন্য। ভালো উক্তি পড়ো, জীবনে গ্রহণ করো। তোমাদের জন্য কিছু ভালে কথা তুলে ধরা হলো–

লেখাপড়া করি
সুন্দর পরিবেশ গড়ি

সবাই মিলে করি কাজ
ছোটো বড়ো নাহি লাজ
সবার হাতে রাখব হাত
আসবে মোদের সুপ্রভাত।

আমি কালো, তুমি সাদা
এত নয় বড়ো কথা
সবার তরে করিব কাজ
ভালোবেসে গড়ব তাজ।

এ পৃথিবী তোমার আমার চিরকাল রবে
হাতে হাত রেখে চলো
কাজ করি তবে।

– মোসলেমা নাজনীন

হারিয়ে যেতে নেই মানা

শাহানা আফরোজ

বন্ধুরা ঘুরে বেরাতে কার না ভালো লাগে বলো তো । হোক না সেটা পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী বা সহকর্মীদের সাথে। কাছে বা দূরে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে অথবা কৃত্রিম কোনো জায়গায়। ঘুরে বেড়ানো মানেই আনন্দ , জ্ঞানের ঝুলিতে আরো কিছু সঞ্চয়, আর পুরনোকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা। আর এজন্য বয়স কোনো বাধাই নয়। ছোট্ট বন্ধুরা যদিও গল্পটা সরকারি সফরের তবুও আনন্দটা তোমাদের চেয়ে কম নয়। Knowledge Sharing নামের একটি প্রশিক্ষণে আমরা মানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী গিয়েছিলাম কক্সবাজার। জায়গাটি অনেকের জন্য পুরনো হলেও আবার অনেকের জন্য ছিল নতুন। ৪ দিনের প্রশিক্ষণ ছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর সারারাত বাস ভ্রমণের পর কক্সবাজার পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গেলাম সমুদ্র তীরে। সবার মাঝে কি যে আনন্দ ,যেন অজানার পানে নিরন্তর ছুটে চলা। সাগরে নামার পরিকল্পনা না থাকলেও সেখানে গিয়ে আর আমাদের থামানো গেল না। নেমে পড়লাম সবাই। মেঘের আড়ালে সুয্যি মামা পাটে নামলেও আমরা ছিলাম বাধাহীন।

এরপর ফ্রেশ হয়ে গেলাম বাংলাদেশের প্রথম মাছের অ্যাকুরিয়াম দেখতে। যা ছিল অবাক করার মতো। মনে হচ্ছিল সমুদ্রের মাঝেই আছি। ডান, বাম, উপর সব জায়গায় মাছেদের অবাধ সাঁতার। বঙ্গোপসাগরের জীববৈচিত্র্য এত্ত সুন্দর নিজ চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাসই করতাম না। পুরো অ্যাকুরিয়াম দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। হোটেলে ফিরে খাওয়া আর ঘুম। তোমাদের বলে রাখি আমরা যখন কক্সবাজার গিয়েছিলাম তখন ছিল নিম্নচাপ। উত্তাল সাগর স্বাভাবিকের থেকে জোয়ার ছিল বেশি। ৩ নাম্বার বিপদ সংকেত।

পরদিন ভোরে উঠে কয়েকজন মিলে চলে গেলাম সমুদ্রে। গিয়ে দেখি আমাদের আগেই আরো কয়েকজন সহকর্মী সেখানে আছে। সূর্য নেই তবু কি অপরূপ মোহনীয় রূপ সাগরের। নিম্নচাপের কারণে বড়ো বড়ো ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। সকল ভয় উপেক্ষা করে আমরা নেমে গেলাম সমুদ্রে। আমাদের হাসির সঙ্গে ঢেউগুলো তাল মিলিয়ে আরো ঘন ঘন হয়ে আসতে লাগল। এরই মাঝে আর্শিবাদ হয়ে এল ঝুম বৃষ্টি। যদিও সারারাত বৃষ্টির পর সকালে একটু কমেছিল। এ যেন সোনায় সোহাগা। গায়ে লাগছে ঢেউ আর অঝোর ধারায় বৃষ্টি। কি যে ভালো লাগা তা বলে বোঝানো যাবে না। এখনও মনে শিহরণ জাগায়। এ দোলা থাকবে বহুকাল।বিপদের আশঙ্কা ছিল তাই গার্ডরা লাল পতাকা লাগিয়ে আমাদের ডাকতে থাকে। মন চাইছিল না তবুও উঠে এলাম।

ফ্রেশ হয়ে রওনা দিলাম বাংলাদেশের আরেক প্রান্ত টেকনাফে । রিজার্ভ করা গাড়িতে মেরিন ড্রাইভ মানে

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে পথ দিয়ে ছুটে চললাম। আর মন খুলে গাইলাম ‘এক পায়ে নুপুর/ অন্য পা খালি/ একপাশে সাগর/ একপাশে বালি...’ মাঝে মাঝে ভালো লাগার জায়গাগুলোতে নেমে পড়লাম। আর মুঠোফোনে বন্দি করে নিলাম কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে আমাদের হারিয়ে যাওয়া।বৃষ্টির মাঝে প্রকৃতি দেখতে দেখতে একসময় পৌঁছে গেলাম আরেক নৈসর্গিক জায়গা নাফ নদীর জেটিতে । সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো বাংলাদেশ স্বর্গের একটি অংশ! মনের অজান্তেই হারিয়ে গেলাম প্রকৃতির বিশালতায়। ওপারে মিয়ানমার, এপাড়ে বাংলাদেশ। মাঝে নদীর মেলবন্ধন। মনে হচ্ছিল কোনো শিল্পী ক্যানভাসে তার মনের রঙে সাজিয়ে দিয়েছে এ দেশকে। সময় বয়ে চলা নদী। তাই ঘণ্টা বাজল ফেরার। বন্ধুরা যদি একটু সময় পাও হারিয়ে যেও বাংলার আনাচে-কানাচে দুচোখ মেলে দেখবে সৌন্দর্যের অপরূপ ভান্ডার এ দেশকে।

পরেরদিন গেলাম সাফারি পার্ক। পশুপাখি আছে তবে চিড়িয়াখানার মতো বন্দি নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে মনের আনন্দে আছে জীবজন্তুগুলো। কৃত্তিম ঘন বনের মাঝে রাস্তা ধরে হাঁটা যায় তবে সাবধান থাকতে হয়। বানরগুলো গাছে গাছে ঝুলছে আর চেচামেচি করছে । লেকের পানিতে সারস,বক,জলহস্তী আপন মনে ঘুরে বেরাচ্ছে। তবে লেকের চারদিকেই নেট দিয়ে ঘিরে দেয়া যাতে মানুষ তাদের বিরক্ত করতে না পারে। বাঘের জন্য আছে আলাদা পরিবেশের সুরক্ষা ঘর। সব মিলিয়ে দারুণ খুশি জীবসমাজ। প্রশিক্ষণের সময় শেষ হয় । মনের কোণে মেঘ জমলেও কক্সবাজার বীচ কেনাকাটা করে ফিরে এলাম ফিরে এলাম হোটেলে। বাক্সপেটরা গুছিয়ে রওয়ানা দিলাম রাতের বাসে । ■

রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড

কামরুল হাসান

চারিদিকে স্বচ্ছ কাচে ঘেরা বিশাল এক অ্যাকোয়ারিয়াম। এর ভেতরে যেতে হয় সুড়ঙ্গেও মতো আঁকবাঁকা পথ দিয়ে। উপরে মাছ , ডানে মাছ, বামে মাছ। হঠাৎ আবার হাঙ্গর মাছ সামনে এসে পরতে পারে, আসতে পারে মানুষ খেকো পিরানহা মাছও। চলতি পথে গায়ে লেগে যেতে পারে কুচিয়া, কচ্ছপ, কাঁকড়া সহ সাগরের তলদেশের নানা কীটপতঙ্গ। কি ভয় পেয়ে গেলে বন্ধুরা। না ভয়ের কিছু নেই। কারণ এগুলোতো কাচের দেয়ালে ঘেরা অ্যাকুরিয়ামের ভিতরে। বাংলাদেশে এরকম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করেছেন উদ্যোক্তা মোহাম্মদ শফিকুর রহমান চৌধুরী।

বৈদ্যুতিক আলোয় অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরের প্রাণীগুলোর দৌড়ঝাঁপ যে-কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করবে। এই অ্যাকোয়ারিয়ামে রয়েছে সাগর ও মিঠা পানির প্রায় ১০০ প্রজাতির জীববৈচিত্র্য। বিরল প্রজাতির মাছসহ হাঙর, পিরানহা, শাপলাপাতা, পানপাতা, কচ্ছপ, কাঁকড়া, সামুদ্রিক শোল, পিতশ্বরী, সাগর কুচিয়া, বোল, জেলিফিস, চেওয়া, পাঙাস,আউসসহ অনেক মাছ ও জলজ প্রাণী। পুরো অ্যাকোয়ারিয়াম জুড়েই রয়েছে সাগর তলদেশের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ। এখানেই শেষ নয়, রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ডে আরো আছে থ্রি- নাইট ডি মুভি দেখার নান্দনিক স্পেস, লাইফ ফিস রেস্টুরেন্ট, শিশুদের খেলার জায়গা , ছবি তোলার আকর্ষণীয় ডিজিটাল ল্যাব এবং কেনাকাটা করার পাশাপাশি বারবিকিউ-এর ব্যবস্থা। সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যে- কোনো সময় ঘুরে আসতে পারো এই অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে। বন্ধুরা, তোমরা কক্সবাজার গিয়ে কেউ এই ফিস মিউজিয়াম মিস করবে না। তাহলে ঘুরার মজাটাই হারাবে। ■

মীনা দিবস

নুসরাত জাহান

মীনা শিশু-কিশোরদের জনপ্রিয় বাংলা কার্টুন। এই কার্টুনটি তৈরি করেছে ইউনিসেফ। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এটি নির্মিত হয়েছে। কার্টুনের মূল চরিত্র মীনা আট বছরের কন্যাশিশু। সে তার পরিবারের সঙ্গে একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করে। এই কার্টুনের মাধ্যমে সে মেয়েদের সচেতন করার চেষ্টা করেছে। যেমন– বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা, মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, কমবয়সি মেয়েদের বিয়ে থেকে স্কুলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, যৌতুক বন্ধ করা, ছেলেমেয়ে সমান পুষ্টি ও সুযোগ-সুবিধার দাবিদার, প্রয়োজনীয় ও সমঅধিকার পেলে মেয়েরাও অনেক কিছু হতে পারে তা বোঝানো, শহরের বাসায় কাজে সাহায্য করে এমন মেয়েদের প্রতি সুবিচার ও তাঁদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ প্রভৃতি। প্রতি বছর ২৪শে সেপ্টেম্বর পালিত হয় মীনা দিবস। সারা বিশ্বের মতো নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযোগ্য পালন করা হয়।

কন্যাশিশু দিবস

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ৩০শে সেপ্টেম্বর। প্রতি বছরের মতো এবছরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এদিনটি উদযাপন করে। এবারের কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য 'কন্যাশিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'।

এ দিবসটিতে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, আজকের কন্যাশিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা আমাদের কন্যা-জায়া-জননী। তাই তাদের নিরাপদে বেড়ে ওঠা এবং তাদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। যদি তারা প্রয়োজনীয় পুষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা ও নিরাপত্তা পায়, তবে তারা উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী নারী হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবে।আমরা দিবসটি পালন করে আমাদের কন্যাশিশুর অধিকারকে সমুন্নত এবং তাদের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হব। ■

শেখ তানভীর ইসলাম (জিতু), অষ্টম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

অনিন্দ্য অন্তরিক্ষ, চতুর্থ শ্রেণি, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

দশ দিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

জলবায়ু বিপর্যয় নিয়ে শিশুদের প্রতিবাদ

১৬ বছর বয়সি গ্রেটা থানবার্গ একজন জলবায়ুকর্মী। সে প্রতি শুক্রবার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সুইডিশ পার্লামেন্টের বাইরে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে।

২০১৮ সালের আগস্টে শুরু করা তার এই আন্দোলনের নাম 'ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার'। সারা বিশ্বের শিশুদের এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায় সে। গ্রেটার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জলবায়ু বিপর্যয় রোধে কার্বন নিঃসারণ কমাতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা। রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে আয়োজিত এক সমাবেশে ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ দাবি জানায়। এ সময় এক হাজার শিক্ষার্থী একযোগে ডিসপ্লেতে দাঁড়িয়ে 'স্টপ এমিশনস নাও' নামক মানব লোগো গড়ে তোলে। এরপর আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিয়ে শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আশঙ্কার কথা তুলে ধরে।

৭৩ বছর বয়সে ফুটবলার

ইসরায়েলের একটি ফুটবল দলের গোলরক্ষক হলেন ইসাক হায়িক। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছেন। একটি পেশাদার ফুটবল খেলায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে এই রেকর্ড গড়েন ৭৩ বছর বয়সি হায়িক। ম্যাচ শেষে এক অনুষ্ঠানে তার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয় গিনেস কর্তৃপক্ষ । হায়িক জানান, যদি আরো একটি ম্যাচ খেলতে তাকে মাঠে নামানো হয়, তার জন্যও তিনি প্রস্তুত।

৫৯ মিনিটে ওষুধ পৌঁছাবে 'গোমেডকিট'

মাত্র ৫৯ মিনিটে তোমাদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেবে অনলাইনে ওষুধ ডেলিভারি সেবা 'গোমেডকিট' (Gomedkit)। 'গোমেডকিট' একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। বর্তমানে ঢাকা শহরে ২৪ ঘণ্টা কার্যক্রম পরিচালনা করছে গোমেডকিট। পরবর্তীকালে এটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ব্যস্ততম শহরে অনেক সময় বাবা-মা বা নিজেদের প্রয়োজনীয় ওষুধ আনতে আমরা ভুলে যাই। এসব প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই এই অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে।

ক্ষতিকর ডিজনির কমিক

ডিজনির বিখ্যাত কমিক সিরিজগুলো পছন্দ নয় এমন শিশু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বছরের পর বছর ধরে ডিজনির কমিক সিরিজগুলো বিশ্বজুড়ে শিশুদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়। 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট', 'আলাদিন'-এর মতো চলচ্চিত্রকে বর্ণবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, এসব ফিল্ম শিশুদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্লেষকরা বলেন, অভিভাবকগণ মনের অজান্তে তাদের সন্তানদের ক্ষতিকর এসব সিরিজ দেখতে দিচ্ছেন। ডিজনির জনপ্রিয় কমিক- স্নো হোয়াইট, স্লিপিং বিউটি কিংবা লায়ন কিং শিশুদের কাছে মানব শরীর নিয়ে বিকৃত এবং অসামঞ্জস্য ধারণা তৈরি হতে পারে। বর্ণবাদ সৃষ্টি করতে পারে এমনকি পারিবারিক সহিংসতাও তাদের মধ্যে জন্ম নিতে পারে।

ভাসমান বাড়ি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের অনেক এলাকা এখন হুমকির মুখে। এই জলবায়ুর পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে ভাসমান বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমস্টারডাম শহরের একটি খালে 'পরিষ্কার জাহাজ' নামে এক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি ভাসমান ভবন গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি ভবনের নিজস্ব ডিজাইন থাকবে। আর ওগুলো বিশেষভাবে তৈরি কংক্রিটের ভেলার উপর ভাসবে। ভাসমান সেই ভেলার কয়েকশ' টন ওজন বহনের ক্ষমতা থাকবে। স্থপতি ইয়রিট হুভ্যার্ট একটি ভবনের নকশা করেছেন। ২০ জন স্থপতি এ প্রকল্পে কাজ করছেন।

গিনেস বুকে ইমরানের রেকর্ড

হাস্যোজ্জ্বল তরুণ ইমরান শরীফের হাতে গিনেস রেকর্ডসের স্বীকৃতি সনদ। ধাতব পেপার ক্লিপ একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগিয়ে দীর্ঘ একটি

শিকল বানিয়েছেন তিনি। এই শিকলেই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি মিলেছে তার। তিনি এককভাবে সবচেয়ে দীর্ঘ পেপার ক্লিপ শিকল বানানোর রেকর্ডধারী।

অনেকগুলো কাগজকে আবদ্ধ করে রাখতে পেপার ক্লিপের জুড়ি মেলা ভার। রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানদের কার্যালয় পর্যন্ত পেপার ক্লিপ খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন জায়গা বোধ হয় নেই। আর ছোট্ট সেই পেপার ক্লিপ ব্যবহার করেই কিনা বিশ্ব রেকর্ড!

ইমরান শরীফ ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে আইন বিষয়ে পড়ছেন। তার পেপার ক্লিপের দৈর্ঘ্য ২.৫২৭ কি.মি.। যুক্তরাজ্যের আয়ারল্যান্ডের বেন মুনের ১.৯৯৭ কি.মি. দৈর্ঘ্যের পুরোনো রেকর্ডকে টেক্কা দেন তিনি। আর পেপার ক্লিপ চেইনটি বানাতে তার ১ লাখ ১৩ হাজার ৭১৫টি পেপার ক্লিপ লেগেছে।

থাকি নিরাপদ, সাবধানে

হাত ধোয়ায় যত ভুল

মো. জামাল উদ্দিন

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জীবনের অঙ্গ। খাবার শুরুর আগে যেমন হাত ধোয়া দরকার, তেমনি খাবার পরিবেশন করতেও হাত ধোয়া জরুরি। আবার খাবার শেষে হাত ধুয়ে মোছার যে তোয়ালেটা সেটাও পরিষ্কার থাকা উচিত। বাইরে বা শুকনো খাবার খাওয়ার সময় মনের অজান্তে অনেক সময় হাত না ধুয়েই আমরা খেয়ে ফেলি।

হাতের স্পর্শের মাধ্যমে ছড়াতে পারে টাইফয়েড, জন্ডিস, ডায়রিয়া, কৃমিরোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, চোখ ওঠা ইত্যাদি অনেক রোগ। সাবান-পানি দিয়ে নিয়মমতো এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে নিলে এসব সংক্রমণ অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা যায়।

কখন হাত ধোয়া দরকার

খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর অবশ্যই হাত ধোয়া দরকার। এছাড়া খাবার তৈরি করা ও পরিবেশনের আগে, শিশুদের ডায়পার পরিবর্তন করা বা শিশুদের মলত্যাগ পরিষ্কার করার পর, কাঁচা মাছ, কাঁচা মাংস, ডিম, সবজি ও ময়লা-আবর্জনা স্পর্শ করার পর, হাত দিয়ে নাক ঝাড়ার পর এবং হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দেওয়ার পরও হাত ধোয়া প্রয়োজন। অবশ্যই মনে রাখবে দরজার নব, টেলিফোন, বেসিনের কল ইত্যাদি হলো জীবাণুর আড্ডাখানা। কেননা, এগুলোতে শত মানুষের স্পর্শ লাগে।

কীভাবে হাত ধোয়া দরকার

প্রথমে পানি দিয়ে পুরো হাত ভেজাতে হবে। তারপর সাবান নিয়ে দুই হাতে মেখে ফেনা করতে হবে। দুই হাতের উভয় দিকে, আঙুলের ফাঁকে, নখের নিচেসহ কবজি পর্যন্ত খুব ভালোভাবে ঘষে নিতে হবে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড সময় ধরে। তারপর পানি দিয়ে হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। হাত ধোয়ার জন্য সাধারণ সাবানের চেয়ে তরল সাবান ভালো। ধোয়া হাত দিয়ে আবার কল বন্ধ করবে না। কনুই অথবা বাঁ হাত দিয়ে কল বন্ধ করতে হবে।

হাত ধোয়ার সময় আমরা সচরাচর কিছু ভুল করে থাকি। যেমন- অনেক সময় এক হাতে সাবান নিয়ে হালকা করে কয়েক সেকেন্ড শুধু হাতের তালু বা আঙুলগুলো কচলে নিই। হাতের দুই দিক এবং আঙুলের ফাঁকাগুলো ঠিকমতো পরিষ্কার করি না। সব শেষে হাত মোছার জন্য সবার ব্যবহৃত তোয়ালে বা গামছা ব্যবহার করি। এসব ভুল করলে হাত ধোয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে না। নবারুণের বন্ধুরা, এখন থেকেই তোমরা হাত ধোয়ার অভ্যাস করো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শরীর ও মন দুটোই ভালো রাখে। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক,৩. রেডক্রসের সদরদপ্তর যে শহরে অবস্থিত, ৫. অল্প, ৭. মস্তিষ্ক, ১০. ক্রোধ, ১১. কারাগার

উপর-নিচ: ১. আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, ২. ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশগুলোর একটি, ৪. এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী, ৬. বৃক্ষের শীর্ষ শাখা, ৮. বাংলা লোকসংগীতের একটি ধারা, ১০. দুর্গ

১					২		
৩		৪					
		৫	৬		৭	৮	
						৯	১০
		১১					

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৫	*		-	৬	=	
+		+		+		+
	*	৪	-		=	৭
-		-		-		+
৭	-		-	৪	=	
=		=		=		=
	+	৫	+		=	১৩

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ল	ফ্রে	ড	নো	বে	ল	
ল					ল		
জে	নে	ভা			জি		
রি		লু			য়া		
য়া		ক	ম		ম	গ	জ
			গ			ম্ভী	
			ডা			রা	গ
		জে	ল	খা	না		ড়

গত সংখ্যার সমাধান

৫	*	২	-	৬	=	৪
+		+		+		+
৩	*	৪	-	৫	=	৭
-		-		-		+
৭	-	১	-	৪	=	২
=		=		=		=
১	+	৫	+	৭	=	১৩

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: কানন, নলখাগড়া, কলম, খাবার, কামান, রামগড়, কোরাল মাছ, মামা, ছাগল, ছত্রখান, ত্রস্ত, মাকাল, দোকান, কানন

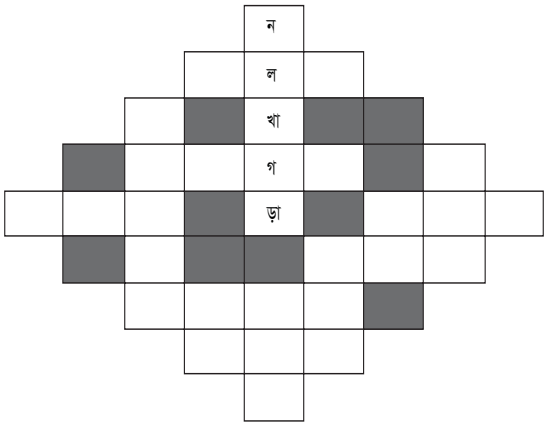

গত সংখ্যার সমাধান:

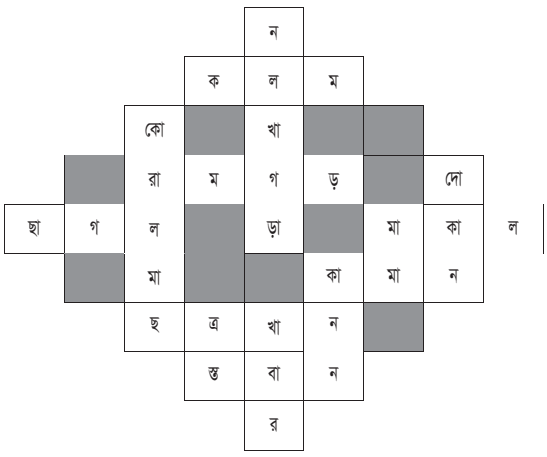

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

২৩		২৭						৩৩
	২৫		৪৫			৪২		
২১		১৭		৪৯			৪০	
	১৯		৪৭		৫১	৩৮		৩৬
১১		১৫	৫৪	৫৩		৬৯		৬৭
	১৩				৭৭		৭১	
৯		৫		৭৯		৭৫		
	৭				৮১		৭৩	
১		৩	৫৮					৬৩

গত সংখ্যার সমাধান

২৩	২৪	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
২২	২৫	২৬	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৩৪
২১	১৮	১৭	৪৬	৪৯	৫০	৩৯	৪০	৩৫
২০	১৯	১৬	৪৭	৪৮	৫১	৩৮	৩৭	৩৬
১১	১২	১৫	৫৪	৫৩	৫২	৬৯	৬৮	৬৭
১০	১৩	১৪	৫৫	৭৮	৭৭	৭০	৭১	৬৬
৯	৬	৫	৫৬	৭৯	৭৬	৭৫	৭২	৬৫
৮	৭	৪	৫৭	৮০	৮১	৭৪	৭৩	৬৪
১	২	৩	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-3, September 2019, Tk-20.00

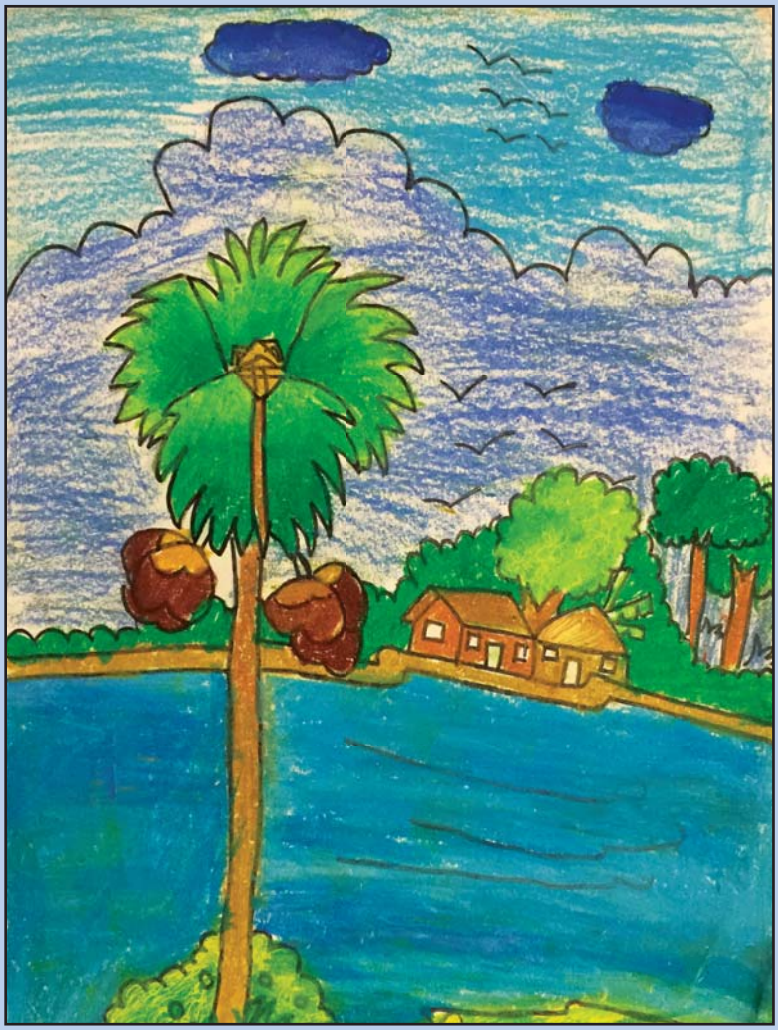

শ্রেয়সী শংকর কুন্ডু, ৩য় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা